গল্পাঞ্জলি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী

প্রকাশক
বাণী দেবী
২, ভবানী দত্ত লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী প্রেস
কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

প্রস্তাবনা

গল্প পড়তে ও শুনতে সবাই ভালবাসে। এতে বয়সের কোন ব্যবধান থাকে না। বয়স্কদের মধ্যেও শিশু-মন আছে। গল্পের মাধ্যমে সূক্ষ্ম নীতিবোধের ভেতর দিয়ে শিশুর উত্তর জীবন সুন্দর করে গড়া যেমন সম্ভব, তেমনি এই বয়স্কদেরও সুস্থ নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাও সম্ভব। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সহজ সরল ভাষায় 'গল্পাঞ্জলি'র গল্পগুলি লেখা হয়েছে।

আশা করি, বইখানা পড়ে সবাই আনন্দ পাবে। ইতি—

প্রকাশক

গল্পসূচী

গল্পাঞ্জলি

—:*:—

অপকারের বদলে উপকার

তিন বন্ধু। তাদের মধ্যে দুই বন্ধু বড় অলস। কোন কাজ তারা করে না, কেবল বসে বসে খায় আর বেড়িয়ে বেড়ায়। আর একজন খুব পরিশ্রমী। কখনও চুপ করে বসে থাকে না। সব সময় কাজ করে বেড়ায়। ফলে রোজগার করে বেশী। ক্রমে সে অনেক টাকা জমিয়ে ফেলল। এবার মনে ভাবল, সে বিদেশে ব্যবসা করবে।

এদিকে অলস দুই বন্ধু বুঝতে পেরেছে পরিশ্রমী বন্ধু অনেক টাকা জমিয়েছে। এখন দিনরাত তাদের পরামর্শ চলছে, কি করে ঠকিয়ে টাকাগুলি হাত করা যায়। কিন্তু কোন সুযোগ হয় না। পরিশ্রমী বন্ধু সব সময় সজাগ আর সতর্ক। কিন্তু যখন তারা শুনল, পরিশ্রমী বন্ধু বিদেশে ব্যবসা করতে চায়, তখন তারা বললে, চল বন্ধু, আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই। আমরাও তোমার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করব। এখানে কিছুই হচ্ছে না। যেখানে কাজ কর্ম করে খেতে পাওয়া যায় না, সেখানে থেকে লাভ কি?

একদিন তিনজনে বার হল দেশ ছেড়ে। তারা চলতে লাগল। ক্রমে তারা এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গেল; এক বন

ছেড়ে অন্য বনে। কত নদী পার হল, কত পাহাড় ডিঙ্গিয়ে গেল। কিন্তু কোথাও কারো কোন সুবিধা হল না। তবু তিনবন্ধু চলছেই।

একদিন চলতে-চলতে রাত হয়ে গেল। তখন তারা এক বনের মধ্যে এসে পড়েছে। আর এগোবার কোন উপায় নেই। বাধ্য হয়েই তারা সেখানে রয়ে গেল। এই বনেই রাত কাটাতে হবে।

অলস বন্ধু দু'জন নিজেদের ভাগ্য ফিরাবার জন্য খুবই চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। তাই তারা ঠিক করল, পরিশ্রমী বন্ধুর টাকা নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। জীবনে আর কিছুই করতে হবে না। পায়ের উপর পা তুলে বসে বসে খাবে।

এবার এক সুযোগ এসে গেল।

পরিশ্রমী বন্ধু ঘুমিয়ে আছে। সারাদিনের খাটুনিতে খুবই ক্লান্ত। অলস বন্ধুরা সুযোগ বুঝে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চোখ দুটি অন্ধ করে দিল। পরে তাকে দড়ি দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে তার সব টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

অন্ধ বন্ধু মনের দুঃখে বনের মধ্যে কেঁদে কেঁদে রাত কাটিয়ে দিল। শেষ রাতে তার মনটা অনেক শান্ত হল; ভাবল, কেঁদে আর কি হবে? চোখ ত আর ফিরে পাব না। বরঞ্চ ভগবানকে ডাকি। ভগবানের দয়ায় কি না হয়। তাই সে আকুলভাবে ভগবানকে ডাকতে লাগল। গাছের সঙ্গে শরীর বাঁধা, তাই সে বসতে পারছে না, শুতেও পারছে না। সুতরাং সে দাঁড়িয়েই ভগবানের নামজপ করতে লাগল।

এখন সেই গাছের উপর ছিল দুটো শুকপাখী। একটা শুক আর একটা শুককে বলছে, রাজার মেয়ের খুব অসুখ। তার অসুখ কিছুতেই সারছে না।

আর একটা শুক জিজ্ঞেস করল, কি করে অসুখ সারবে ?

প্রথম শুক জবাব দিল, এ গাছের নীচে যে ফুলগাছটা আছে, তাই পুড়িয়ে ছাই করতে হবে। জলের সঙ্গে সেই ছাই খাইয়ে দিলে, রাজকুমারী সেরে উঠবে।

দ্বিতীয় শুক আবার জিজ্ঞেস করল, এই যে অন্ধ লোকটি এখন গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে, এর চোখ কি করে সারবে ?

প্রথম শুক জবাব দিল, আজ ভোরে যে শিশির পড়বে, সেই শিশির যদি সে চোখে মাখে, তাহলেই তার চোখ সেরে যাবে।

দ্বিতীয় শুক আবার জিজ্ঞেস করল, রাজ্যের আর খবর কি ?

প্রথম শুক জবাব দিল, রাজ্যে বড় জলের অভাব। লোকের বড় কষ্ট। কিন্তু এ কষ্ট কেমন করে দূর করা যায়, তা কেউ জানেনা। আমি তা জানি। রাজ্যে একটা বাজার আছে। বাজারের কাছে একটা বড় মাঠ। বড় মাঠটার পুব কোণে আছে একটা চৌকো পাথর। এই চৌকো পাথরের নীচের মাটি খুঁড়তে পারলে বার হবে একটা ঝরনা। এই ঝরনা থেকেই রাজ্যের জলের অভাব মিটতে পারে।

লোকটি শুনতে পেল সব কথা। এবার আবার তার মনে সাহস এল। সে ঠিক করল, সে আবার বাঁচবার চেষ্টা করবে। এইভাবে মরা তার চলবে না। তাকে বাঁচতেই হবে।

এমনি সময় হঠাৎ পায়ে তার ঠেকল একটা ছোট পাথর। পায়ের আঙ্গুল দিয়ে কোনমতে সেই পাথরটা সে হাতে তুলে নিল। তারপর দড়িতে সে পাথর ঘষে ঘষে সে বাঁধন কেটে ফেলল। এবার সে মুক্ত। ইচ্ছামত সে চলাফেরা করতে পারবে। মুক্ত হয়েই প্রথমে সে শিশির খুঁজতে সুরু করল।

তখন ভোর হয়েছে। বনের মধ্যে প্রচুর ঘাস। সে ঘাসে পড়েছে অনেক শিশির। হাতড়ে হাতড়ে সে সেই শিশির নিয়ে চোখে লাগাতেই, চোখ তার ভাল হয়ে গেল। এই ত বেশ সে দেখতে পাচ্ছে! এই ত বনের গাছপালা! আকাশে ঐ ত সূর্য উঠছে! মনের আনন্দে সে লাফিয়ে উঠল।

এমন সময় তার নজরে পড়ল ফুলগাছটা। এই গাছের কথাই ত শুকপাখী বলেছে। সে একটা ফুল তুলে নিয়ে সেটাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল। আর সেই ছাই কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিল। তারপর সে রওনা হল, সেই রাজ্যের দিকে, যে রাজ্যের রাজার মেয়ের অসুখ সারছে না।

দু'দিন হেঁটে সে পৌঁছুল রাজধানীতে। সেখানেই সে শুনতে পেল রাজা ঘোষণা করেছেন, যে রাজকন্যার চোখ সারাতে পারবে, তারই সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হবে। আর যে সারাতে এসে সারাতে পারবে না, তাকে কেটে ফেলা হবে।

একদিন সকালবেলা। রাজবাড়ীর দেউড়ীতে দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে এসে সে বললে, আমি রাজকন্যার অসুখ সারাব।

দারোয়ান বললে, ভাই, তুমি ফিরে যাও। কেউ যা পারে নি, তা তুমি পারবে কেন? কত হাকিম, কত বদ্যি, কত সাধুসন্ন্যাসী এল। কেউ আর প্রাণে নিয়ে ফিরে যেতে পারল না। সবারই গর্দান গেল। তুমি মিছামিছি কেন প্রাণটা দেবে? ফিরে যাও।

লোকটি বললে, আমার প্রাণ যায় যাবে। তুমি রাজাকে খবর দাও।

দারোয়ান আর কি করে। রাজাকে গিয়ে জানাল, মহারাজ, একটা লোক এসেছে। সে বলছে রাজকন্যাকে সারিয়ে তুলবে।

রাজা হুকুম দিলেন, নিয়ে এস।

লোকটি গিয়ে ধীরে ধীরে রাজকুমারীর বিছানায় কাছে দাঁড়াল। একজন দাসীকে বললে, এক গ্লাস জল নিয়ে আসতে। দাসী জল নিয়ে এল। লোকটি নিজের কাপড়ের খুঁট খুলে ফুলের ছাই জলে মিশিয়ে রাজকুমারীকে খেতে দিল।

দু'দিন পরেই রাজকুমারী ভাল হয়ে গেল। রাজা-রাণীর আনন্দের আর সীমা নেই। প্রাসাদের মধ্যে উৎসব শুরু হল। নাচে গানে রাজধানীর লোক একেবারে মেতে উঠল।

লোকটিকে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসা হল।

সে একদিন রাজাকে বললে, মহারাজ, দেখছি, রাজ্যে বড় জলের কষ্ট! আপনি এক কাজ করুন। বাজারের কাছের মাঠের পূব দিকে একটা চৌকো পাথর আছে। তার নীচের মাটি কাটুন। বেরুবে, একটা বড় ঝরনা, এই ঝরনায় রাজ্যের জলের অভাব মিটবে।

তৎক্ষণাৎ রাজার লোক ছুটে গেল বাজারে। সত্যিই বাজারের কাছের মাঠের পূব দিকে পড়ে আছে একটা চৌকো পাথর। চৌকো পাথর সরানো হল। মাটি কাটা হল। সঙ্গে সঙ্গেই ঝরনায় জল উছলে উঠল। রাজা ত মহাখুশী। রাজ্যের লোক আনন্দে আত্মহারা। রাজকুমারীর সঙ্গে লোকটির বিয়ে হয়ে গেল। এখন সে রাজার জামাই। বড়ই সুখে তার দিন কাটছে।

একদিন রাজার জামাই বেড়াতে চলেছে। সঙ্গে তার লোক-জন কেউ নেই। খানিক দূর গিয়েই সে দেখে ছোট একটা কুঁড়ে ঘরে দু'জন লোক বসে আছে। দেখেই সে তার দুই দুষ্টবন্ধুকে চিনতে পারল। সে তাদের কাছে গিয়ে বললে, লোভে পড়ে তোমরা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিলে। বনের মধ্যে ফেলে গিয়েছিলে। আমার টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছিলে। কিন্তু দেখ, ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন। এখন এ রাজ্যের আমি ভবিষ্যৎ মালিক। আমি হুকুম করলে এখনই প্রহরীরা তোমাদের বন্দী করবে।

দুষ্টবন্ধু দু'জন তাড়াতাড়ি তার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, তারপর বললে, বাঁচাও ভাই, আমাদের বাঁচাও। আমরা জীবনে আর পাপের কাজ করব না।

রাজার জামাই আসলে খুব ভালো লোক। সে তাদের ক্ষমা করল। শুধু তাই নয়। রাজাকে বলে তাদের রাজসরকারে চাকরি করে দিল।

দুষ্টবন্ধুদের স্বভাব একেবারে বদলে গেল।

বুনো রাজা আর রাজকুমারী

এক বুনো রাজা। বনেই তাঁর রাজত্ব। যত অসভ্য জংলী তাঁর প্রজা। প্রজাদের ঘর নেই, দোর নেই। তারা থাকে গাছের তলায়, বনের ভিতর। কেউ বা বাঁশ দিয়ে, খড় দিয়ে, গাছের পাতা দিয়ে ঘর তৈরী করে। রান্না-বান্নার বালাই নেই। তীরধনুক দিয়ে তারা জন্তুজানোয়ার শিকার করে। আর শিকার করা পশুর মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে খায়। কাপড় বুনতে তারা জানেনা। তাই তারা পরে পশুর চামড়া।

বুনো রাজার কিন্তু বাড়ী আছে। প্রজাদের মতই লতাপাতার বাড়ী। তবে অনেকগুলি ঘর। রাজা থাকেন সেই রাজবাড়ীতে। সিংহাসনও একটা আছে—একটা বড় পাথরের চাঙড়া। রাজা বসেন সেইখানে। এই আসনে বসেই তিনি বিচার করেন। তাঁর একটা সৈন্যদলও আছে। তাদের এক হাতে বর্শা আর এক হাতে ঢাল। পিঠে তীরধনুক। গায়ে উল্কি। কালো তাগড়া চেহারা। দেখলেই ভয় হয়। এরাই রাজার জন্য যুদ্ধ করে।

রাজার কিন্তু রানী নেই। রানী না হলে রাজত্ব চলে না। রাজার পণ তিনি কালো রানী বিয়ে করবেন না। ধবধবে ফর্সা রানী চাই। কিন্তু বনবাদারে এমন সুন্দরী রানী কোথায় পাওয়া যায়! অনেক খোঁজাখুঁজি চলেছে, পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যের সব লোক মনের দুঃখে দিন কাটায়। রাজার মনেও শান্তি নেই।

একদিন রাজা তার সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় এক চর এক নতুন খবর নিয়ে এল। সে বললে, মহারাজ, আমাদের বন থেকে দু'দিনের পথে আছে এক রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজা আছে। রাজার আছে এক সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মেয়েটি বড় অহঙ্কারী। কোন বর তার পছন্দ নয়। যে বরই বিয়ে করতে আসছে, তার একটা খুঁত সে বার করছেই। কারো নাক নাকি ব্যাঙের মত চেপ্টা, কারো পেট জালার মত, কেউ বাঁশের কঞ্চির মত ঢেঙা, কেউ বেঁটে বামন, কেউ আলুর মত গোল, কারো চলন ক্যাঙ্গারুর মত—এমনি কত কি। সবাই অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়েছে। রাজকুমারীর ঠাট্টাবিদ্রূপে মুখ লাল করে তারা সরে পড়েছে। এবার রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন আর সাতদিন দেখবেন। এর মধ্যে রাজকুমারীর বিয়ে হয়, ভালোই। নয়ত আট দিনের দিন সকাল বেলা রাজা যাকে প্রথমেই দেখবেন তার হাতেই মেয়ে দেবেন। রাজকুমারীর আর কোনো কথা শুনবেন না।

চর আরো বললে, রাজা প্রত্যহ খুব ভোরে একা যায় অন্দর মহলের পুকুরে স্নান করতে। রাজার হুকুমে তখন কেউ সেখানে যেতে পারে না। স্নান করবার এই সময়ে দেখা করতে পারলেই, রাজকন্যাকে পাওয়া যেতে পারে। যতদূর মনে হয়, এই সাত দিনের মধ্যে রাজকন্যার বিয়ে হবে না।

বুনো রাজা শুনলেন সব কথা, কিন্তু কেমন করে রাজার অন্দর মহলে যাওয়া যায়? ভাবতে ভাবতেই তিনদিন কেটে গেল।

চার দিনের দিন বুনো রাজা সকালবেলা একা বেড়াতে বার হয়েছেন। সঙ্গে আর কেউ নেই, খানিক দূর গিয়েই দেখে জঙ্গলের মধ্যে তিন দৈত্য ঝগড়া করছে। বুনো রাজাকে দেখেই তিনজন একসঙ্গেই বললে, এই যে রাজা এসেছেন। রাজাই এই সম্পত্তি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

বুনো রাজা এগিয়ে এলেন। এসে দেখলেন, এক জোড়া খড়ম, একখানা তরোয়াল, আর একটা জামা। এই নিয়েই বিবাদ। এই জিনিসগুলো তিন জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে।

দৈত্যরা রাজাকে বললে, এই খড়ম জোড়া পায়ে দিলে যে কোন জায়গায় যাওয়া যায়। এই জামা যে পরে তাকে আর কেউ দেখতে পায় না, সে একেবারে অদৃশ্য ভাবে থাকতে পারে। আর তরোয়ালকে বললেই হল, মাথা কেটে নাও। যে কোন লোকের তখুনি মাথা কাটা যাবে।

বুনো রাজা দেখলেন, মজা মন্দ নয়। খড়মজোড়া পেলে ত ভালোই হয়। রাজবাড়ীর অন্দর মহলে যেতে আর কোন অসুবিধাই হবে না। কিন্তু কি করে খড়ম জোড়া নেওয়া যায়।

বুনো রাজা দৈত্যদের বললে, জিনিসগুলি আমি আগে পরীক্ষা করে ত দেখি, তারপর কি ভাবে ভাগ করা হবে, তা বিবেচনা করব। আচ্ছা, তরোয়ালটা আগে আমায় দাও।

দৈত্যরা দেখল, মহাবিপদ। বুনো রাজা যদি তরোয়াল নিয়ে বলেই বসেন, দৈত্যদের মাথা কেটে ফেল। তা হলেই ত সম্পত্তি সব গেল। প্রাণও গেল।

দৈত্যদের মনের ভাব বুঝে বুনো রাজা বললেন, তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি গাছের উপর এর পরীক্ষা করব।

বুনো রাজার কথায় বিশ্বাস করে তারা তরোয়ালটা তাঁর হাতে দিল। তিনি সামনের একটা বড় গাছের উদ্দেশে বললেন, তরোয়াল একে কেটে ফেল।

সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল ছুটল। মুহূর্ত-মধ্যে গাছের ওপরের দিকটা মাটিতে পড়ে গেল। গুঁড়ি যেমন ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর জামার পরীক্ষা। জামাটা পরতেই কেউ আর বুনো রাজাকে দেখতে পেল না।

এবার খড়মের পরীক্ষা। বুনো রাজা খড়ম পায়ে দিয়েই বললেন, আমাকে দক্ষিণ দিকের পাহাড়টার নীচে নিয়ে চল।

খড়ম বুনো রাজাকে নিয়ে উড়ে গেল। রাজা আর ফেরেন না। দৈত্য তিনজন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল। সকাল থেকে দুপুর হল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, কই, রাজা কই।

রাজা আর ফিরে এলেন না। তাদের সম্পত্তিরও আর ভাগ হল না। বাকী দুটো জিনিস নিয়ে তিন দৈত্য সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

এদিকে খড়ম পায় দিয়ে আটদিনের দিন, বুনো রাজা খুব ভোরে এসে বসে রইলেন সেই অন্দর মহলের পুকুরের ঘাটে। রাজাও প্রতিদিনের মত নাইতে এসে প্রথমেই দেখল, বুনো রাজাকে।

ফলে বুনো রাজার সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে হল। রাজকুমারী ত রেগে অস্থির। কিন্তু রাগলে আর কি হবে। বুনো রাজা রাজকুমারীকে নিয়ে এলেন নিজের রাজ্যে। বুনো রাজার বাড়ী দেখে রাজকুমারী কেঁদে ফেলল।

বুনো রাজা বললেন, কেঁদে আর কি হবে বল। এখন থেকে তোমাকে এই বাড়ীতেই থাকতে হবে, থাকতে হবে এই বনে। শুধু তাই নয়। তুমি বুনো দেশের রানী হলেও তোমাকে খেটে খেতে হবে। এখানে বসে কেউ থাকে না, সবাই কাজ করে।

খাওয়ার কথা শুনে রাজকুমারীর চোখে জল এল। আগুনে ঝলসানো মাংস খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে নাকি? কেউ কি থাকতে পারে লতাপাতার ঘরে? শিকার সে জন্মেও করে নি। শিকার করতে যেতে হবে, এই বুনোদের সঙ্গে!

কিন্তু উপায় কি? রাজকুমারীর অহঙ্কার আর রইল না। বাধ্য হয়ে তাকে সকল কাজে হাত দিতে হল। প্রথম প্রথম তার কষ্ট হত। বাপের বাড়ীতে সে সুখে কাটিয়েছে। স্বচ্ছন্দে জীবন চলে গিয়েছে। মুখের কথা ফেলতে না ফেলতেই দাসদাসী হাজির।

আর এখানে?

তবু ক্রমে তার সব সয়ে গেল। কাজ করতে করতে ক্রমে রাজকুমারীর মনে আনন্দ এল। এখন ত এই তার দেশ, চিরজীবন এই বুনো দেশেই থাকতে হবে।

কিন্তু বুনোদের কি আছে? ঘর নেই, দোর নেই। রান্না করে জিনিস খেতে এরা জানে না। কেউ কাপড় বুনতে জানে না। রাস্তা নেই, ঘাট নেই, বাজার-বন্দর কিছু নেই।

রাজার কুমারী বাপের বাড়ীর দেশ থেকে নিয়ে এল কামার, কুমোর, ছুতার। নিয়ে এল রাঁধুনি আর নানারকম খাবার জিনিস; নিয়ে এল কৃষক।

রাজকুমারী নিজেই তাদের সঙ্গে কাজে লেগে গেল। বন-জঙ্গল পরিষ্কার হতে লাগল। বুনো লোক কাজ শিখতে লাগল। মাঠে ধান চষা আরম্ভ হল। ধানে ধানে মাঠ ছেয়ে গেল। বাড়ী উঠল। ঘর উঠল, রাস্তা হল, ঘাট হল। রাজবাড়ী সুন্দর করে তৈরী করা হল। সোনার সিংহাসন গড়ে উঠল। লোকেরা কাপড় বুনতে শিখল। কাপড় পরতে শিখল। তারা রান্না করে খেতে শিখল।

বুনো দেশ সোনার দেশ হয়ে গেল।

রাজকুমারী এবার সত্যিকারের রাজরানী হল। প্রজারা সব তাদের রানীর গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল।

রানীর জয় জয়কার। রাজাও খুব খুশী। রাজা-রানী পরম সুখে রাজত্ব করতে লাগল।

কাঠুরে ও পাখী

এক কাঠুরে বড় গরীব। সংসারে তার কেউ নেই। প্রতিদিন সে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটে। সেই কাঠ বাজারে বিক্রী করে যা পায়, তাতেই তার দিন কোন মতে চলে।

একদিন কাঠুরে বনে গিয়েছে কাঠ কাটতে। সামনে দেখতে পেল একটা বড় গাছ। সে কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে শুরু করল। ঠক্ ঠক্ শব্দে গাছের পাখীগুলি উড়ে গেল। ক্রমে সে গাছের গুঁড়িটা কেটে ফেলল। মড় মড় করে গাছটা পড়ে গেল। গাছ পড়ার শব্দে সমস্ত বনটা যেন কেঁপে উঠল। পাশের গাছগাছালি অনেক ভেঙ্গে গেল। চারদিকে পাখীরা কিচির-মিচির করে উঠল।

কাঠুরে এবার কাটা গাছটার কাছে এগিয়ে গেল। এখনো তার অনেকক্ষণ পরিশ্রম করতে হবে। সমস্ত গাছটাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটতে হবে। কুড়ুল তার হাতেই আছে। গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছে, কোথেকে কাটা শুরু করবে, যাতে কম পরিশ্রমে কাজ শেষ করা যায়। এমন সময় একটা শব্দ তার কানে ভেসে এল। সে গাছটার দিকে চেয়ে দেখতেই, তার নজরে পড়ল গাছের মধ্যে একটা ছোট্ট কোটরে একটা ছোট্ট পাখী। এই পাখীটাই শব্দ করছে। কাঠুরেকে ডেকে এবার পাখীটা বললে, আমাকে বাঁচাও, ভাই, আমি বার হতে পারছিনা।

পাখীর কথা শুনে কাঠুরে ত অবাক। পাখী কথা কয়, এ ব্যাপার সে কোন দিন শোনেনি, দেখেনি। সে বুঝল, এ সাধারণ পাখী নয়। সাধারণ পাখী তো আর কথা বলতে পারে না! কাঠুরে ধীরে ধীরে কোটর থেকে পাখীটাকে বার করে ছেড়ে দিল। পাখীটা কিন্তু উড়ে গেল না। সে এসে বসল কাঠুরের কাঁধে। তারপর বললে, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তোমার ভালো হবে। আমি যে-সে-পাখী নই, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। এক কাজ কর। আমার মাথায় টোকা দাও দেখি।

পাখীর মাথায় সুন্দর এক ঝুঁটি। কাঠুরে খুব আস্তে আস্তে ঝুঁটির পালখগুলি সরিয়ে একটা টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাখীর চেহারা বদলে গেল। ছোট্ট পাখীটা হয়ে গেল এত বড় যে, একজন মানুষ তার পিঠে চড়ে বসতে পারে।

আবার পাখী বললে, এবার আমার লেজে টোকা দাও। কাঠুরে পাখীর লেজে টোকা দিতেই সে আবার ছোট্ট হয়ে গেল। যেমন আগে ছিল তেমনি হল।

পাখীর কাণ্ড দেখে কাঠুরের যেন কেমন ভয়ভয় করতে লাগল। দানব-দৈত্য নয় ত? কিংবা পরী-টরী?

কাঠুরের মনের ভাব বুঝতে পেরে পাখী বললে, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। তুমি যেখানে যেতে চাও, পিঠে বসিয়ে আমি তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাব।

কাঠুরে তার কাজ শেষ করে পাখীটাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

তার পরের দিন সকাল বেলা। কাঠুরে ভাবছে, আজ আর কোন কাজ নয়। কখনো ত কোন দিন গাঁয়ের বাইরে যাই নি, কোন দেশ দেখিনি, বড় বড় শহর-বন্দর দেখিনি। পাখীর পিঠে চড়ে একবার বেড়িয়েই আসি। এই মনে ভেবে পাখীটার মাথায় সে টোকা দিল। দেখতে দেখতে ছোট্ট পাখী বড় হয়ে গেল। তারপর কাঠুরে চড়ে বসল তার পিঠের উপর।

পাখীও তার পাখা মেলে দিয়ে আকাশে উড়ল। প্রথম প্রথম তো কাঠুরে ভয়ই পেয়ে গেল। যদি পড়ে যায়। তা হলে আর রক্ষা নেই। আর বাঁচতে হবে না। দেশ বেড়াবার সখ একেবারেই মিটে যাবে। কিন্তু বেশীক্ষণ এই ভয় রইল না। ক্রমে সাহস বেড়ে গেল। মন আনন্দে ভরে গেল। পাখী আকাশে উড়ে যাচ্ছে। নীচের বাড়ী, ঘর, জায়গা, জমি ছবির মত দুরে দূরে সরে যাচ্ছে। উপর থেকে মনে হচ্ছে বাড়ী-ঘরগুলি সব ছোট্ট ছোট্ট যেন পুতুল খেলার ঘরদোর। মানুষগুলি যেন ছোট্ট ছোট্ট পুতুলের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে। বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালা, মাঠ-ঘাট কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু নজরে পড়ছে একটানা সবুজের ছোপ। বেশ লাগছে। উড়তে উড়তে তারা এল একটা বড় শহরে। সে শহর এক রাজার রাজধানী। কাঠুরে বললে, আর উড়ে কাজ নেই। এবার নীচে নামা যাক। শহর দেখব, রাজবাড়ীও দেখব। তারপর যা হয়, করা যাবে।

পাখী রাজবাড়ীর বড় বাগানের এক কোণে নেমে পড়ল। তখন সেখানে জনপ্রাণী নেই। কেউ তাদের দেখতে পেল না। কাঠুরে পাখার লেজে টোকা দিতেই, সে আবার ছোট্ট হয়ে গিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে কাঠুরের কাঁধের উপর বসল।

বাগানের ভিতর দিয়ে কাঠুরে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। কেউ কোথাও নেই। কোন দিকে কোন সাড়াশব্দও নেই। মনে হচ্ছে, বাড়ীর সব লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ আর জেগে নেই।

কাঠুরে খুব অবাক্ হল। সে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। রাজবাড়ীর অন্দরমহলের কাছে এসে দেখে, না, সবাই ত জেগে আছে। তবে কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই চলছে, ফিরছে, কাজ করছে, যাচ্ছে, আসছে, কিন্তু একেবারে নিঃশব্দে। সবারই মুখ মলিন। যেন ভীষণ এক বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, এ রকম থম্‌থমে ভাব। খানিকক্ষণ পরেই কাঠুরে জেনে নিল ব্যাপারটা। রাজার একমাত্র মেয়ে, তার কঠিন অসুখ। জীবনের তার আর কোন আশাই নেই। গণৎকার বলেছে, আগামী কাল ঠিক সন্ধ্যার সময় রাজকুমারীর মৃত্যু হবে। বদ্যি বলেছে, তাকে বাঁচাবার একমাত্র ঔষধ একটি অমৃতফল। এটি আছে দক্ষিণ দিকে একটি পাহাড়ের মাঝখানে। পাহাড়টা এখান থেকে চারদিনের পথ। পাহাড়টার রঙ নীল। এই নীল পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটি গাছ। গাছটির রঙ সোনার মত। সেই গাছে বছরে একটিমাত্র ফল ফলে। সেটিই অমৃতফল। রাজকুমারীকে

যদি এই অমৃতফলের রস খাওয়ানো যায়, তবেই আবার সে বেঁচে উঠবে। এই ফল আনবার জন্য আজ একমাস ধরে কত লোক কত চেষ্টা করছে। কোন চেষ্টাই সফল হয় নি। কেউ সে অমৃত-ফল আনতে পারে নি। যারা ফল আনতে গিয়েছে, তারা আর ফিরে আসেনি। হয় মরে গিয়েছে, নয় পালিয়ে গিয়েছে। আর মাত্র একটি দিন বাকী। আগামী কাল সূর্যাস্তের মধ্যে এই অমৃত-ফল না এলে রাজকুমারীর মৃত্যু হবে।

সব শুনে কাঠুরে ভাবতে লাগল। যদি কেউ অমৃত-ফল এনে রাজকুমারীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে, তাহলে রাজা তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেবেন। সে আর গরীব থাকবে না। সুখে স্বচ্ছন্দে তার দিন চলে যাবে।

কাঠুরের কাঁধে ছিল সেই ছোট্ট পাখী। কাঠুরে পাখীর ঝুঁটি ধরে টোকা দিল। দেখতে দেখতে পাখীটা খুব বড় হয়ে গেল। কাঠুরে বললে, এবার আমাকে নিয়ে চল নীল পাহাড়ের চূড়ায়। সেখান থেকে আমি অমৃত-ফল নিয়ে আসব। আগামী কাল সূর্য ডোববার আগেই আমাদের ফিরতে হবে।

এই বলে কাঠুরে পাখীর পিঠে চড়ে বসল। ডানা মেলে দিয়ে পাখাও উড়ল আকাশে। নীল আকাশের নীচে পাখী উড়ে চলেছে। পেরিয়ে যাচ্ছে কত পাহাড়পর্বত, কত নদীনালা, কত বনবাদাড়। ক্রমে সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবে গেল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কোন দিকে কিছু দেখা যায় না। তবু পাখী থামল না। ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে উড়ে চলল। রাত্রি শেষ হল।

বুদ্ধির জয়

এক চাষীর এক কুকুর ছিল। কুকুরটা বুড়ো হয়ে পড়েছে। তাই চাষী তাকে খেতে দেয় না। আবার, বাড়ী থেকে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেয়। মনের দুঃখে কুকুর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। খেতে পায় না। ক্রমে সে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

একদিন রাত্রিবেলা কুকুরটা চাষীর বাড়ীর ভিতর ঢুকে একেবারে রান্নাঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। চাষী তখন খেতে বসেছে। চাষী-গিন্নী তাকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে।

কুকুর শুনতে পেল, চাষী তার গিন্নীকে বলছে, এ কুকুরটা বুড়ো হয়ে গিয়েছে। একে এবার একেবারে তাড়িয়েই দেব। আর একটা কুকুর পুষব।

চাষী-গিন্নী জবাব দিল, কুকুরটা বুড়ো হয়েছে। তাই তেমন আর পাহারা দিতে পারে না। তাই বলে তাড়িয়ে দেবে? একদিন ত এ পাহারা দিয়েছে, ছোট ছোট ছেলেকে আগলে রেখেছে। তুমি কুকুরটাকে ডেকে খেতে দাও।

চাষী রেগে বললে, না। আর একটা নতুন কুকুর পুষবই। দু'একদিনের মধ্যেই নিয়ে আসব।

চাষী-গিন্নী আর কিছু বললে না। চুপ করে গেল। কুকুরটা ধীরে ধীরে পাশের বনের ভিতর ঢুকে গেল।

এখন, সেই বনে ছিল একটা শেয়াল। কুকুর জানে, শেয়ালের খুব বুদ্ধি। সে শেয়ালকে সব কথা খুলে বললে।

কুকুরের কথা শুনে শেয়াল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, তুমি কিছু ভেবো না, একটা উপায় বার করবই। চল এখন ত কিছু খেয়ে আসি।

কুকুরের তাতে আপত্তি নেই। শেয়ালের সঙ্গে সঙ্গে সে বনের ভিতর এগোতে লাগল, শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াল চাষীর বাড়ীর কাছে।

কুকুরকে ডেকে শেয়াল বললে, আজ তোমারও কিছু খাওয়া হয়নি, আমারও না। চল আজ চাষীর রান্নাঘরে ঢুকে খেয়ে নি। তুমি ত বাড়ীর সব জান। পথ দেখিয়ে এগিয়ে চল।

শেয়ালের কথায় কিন্তু কুকুর রাজী হল না। চাষী হয়ত তাকে আজ তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বলে এতদিনকার মনিবের সে অপকার করবে ? কুকুর বললে, আমি ভাই, তা পারব না। বরং অন্য বাড়ী চল, আমি সব বাড়ীরই পথঘাট চিনি।

শেয়ালের এখন খাবার পেলেই হল। এবাড়ী ওবাড়ী বলে কোন কথা নেই। চুরি করেই যখন খেতে হবে, তখন যেখানে সুযোগ আর সুবিধা আছে, সেখানে যাওয়াই ভাল। আবার দু'জনে পথে বার হল।

সামনেই আর একটা বাড়ী। কুকুর ও শেয়াল সে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। চুপে চুপে তারা এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের কাছে। কুকুর দেখল রান্নাঘরের দোরে শিকল দেওয়া। কুকুর হতাশ

হয়ে শেয়ালের মুখের দিকে চাইল, রান্নাঘর শিকল দেওয়া। তারা ঢুকবে কেমন করে ?

শেয়াল বুঝল কুকুরের মনের কথা। সে বললে, তুমি ভেবো না, ভাই। সব ঠিক হবে। আমি যা বলি, শোন।

শেয়ালের কথামত কুকুর এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের দাওয়ার উপর। শেয়াল চড়ে বসল কুকুরের পিঠে। কুকুরের পিঠে দু'পায়ে ভর দিয়ে শেয়াল সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর আর দু'পায়ের এক পা রাখল দোরের ওপর আর এক পা নিয়ে গেল শিকলটার কাছাকাছি। তারপরই খুট করে আওয়াজ। শিকল খুলে গিয়েছে।

তারপর আর কি। দোর খুলে মহানন্দে তারা ভোজে লেগে গেল। পেট ভরে খেয়ে দু'জনেই বেরিয়ে এল।

শেয়ালের বুদ্ধি দেখে কুকুর ত অবাক !

এ ঘটনার দু'দিন পরের কথা।

কুকুর এসে শেয়ালকে ধরে বসল, যা হয় কর, ভাই। আমার মনিব কাল আমাকে একেবারে তাড়িয়ে দেবে। নতুন কুকুর আসছে।

শেয়াল বললে, আমি ত দেখি, প্রত্যেক দিন চাষী আর চাষী-গিন্নী তাদের ছোট ছেলেটিকে নিয়ে মাঠে যায়। মাঠের কাছে তাকে শুইয়ে রেখে তারা মাঠে কাজ করে। কাল আমরা দু'জনেই একসঙ্গে মাঠের কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকব। ছেলেটিকে শুইয়ে রেখে যেই চাষী ও চাষী-গিন্নী মাঠের

কাজ শুরু করবে, আমি অমনি ছেলেটিকে ধরতে যাব। আর তুমি বেরিয়ে এসে আমাকে তাড়া করবে। আমি পালিয়ে যাব।

বোকা কুকুর জিজ্ঞাসা করলে, তাতে কি হবে ?

শেয়াল বললে, দেখই না কি হয়।

সেদিন চাষী ও চাষী-গিন্নী মাঠে গিয়েছে। সঙ্গে তাদের কোলের ছেলেটি। ছেলেটিকে গাছের নীচে শুইয়ে রেখে তারা মাঠে কাজ করতে নেমেছে। ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে। তারা সবেমাত্র কাজ শুরু করেছে, এমন সময় শেয়ালটি এসে ঘুমন্ত ছেলেটির কাছে দাঁড়াল। মা মাঠে কাজ করছে। কিন্তু মায়ের মন ছেলের কাছে পড়ে আছে। ছেলের কাছে শেয়াল দেখতে পেয়েই সে চীৎকার করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কুকুর ছুটে এল। কুকুরকে দেখে শেয়াল যেন কতই ভয় পেয়েছে, এই ভাব দেখিয়ে সে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

চাষী-গিন্নী তাড়াতাড়ি এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিল। চাষীও সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল।

কুকুর তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। চাষী-গিন্নী এবার চাষীকে বললে, তুমি ত কুকুরটা তাড়িয়ে দিচ্ছিলে। আর সেই ত আজ আমাদের ছেলেকে বাঁচাল। আমি কখনো কুকুরটাকে ছাড়ব না।

নিজের ব্যবহারে চাষীর মনে বড় দুঃখ হল। এই কুকুর এককালে তার কত উপকার করেছে। আজও শেয়ালের মুখ থেকে ছেলেকে বাঁচিয়েছে, একে কিনা সে তাড়িয়ে দিচ্ছিল!

চাষী কুকুরের কাছে এসে তার পিঠ চাপড়ে দিল।

কুকুরটাও আনন্দে চাষীর পায়ের নীচে গড়িয়ে পড়ল।

সেদিন থেকে কুকুরের আদর বেড়ে গেল। চাষী-গিন্নী তার খুব যত্ন করে, খুব খেতে দেয়। চাষীও কুকুরকে আর ছাড়ে না। সব সময় সঙ্গে নিয়ে যায়। যখন সে খেতে বসে, তখন কুকুরও একটু দূরে বসে যায়। চাষীর পাতের ভাল ভাল খাবার, মাংস, ভাত, দইএর ভাগ কুকুরও পায়।

দিনে দিনে কুকুরের চেহারা ফিরে গেল। বেশ মোটা-সোটা হয়ে উঠল। গায়ে শক্তি হল। আবার আগের মত বাড়ীর পাহারা দিতে লাগল।

আবু কাশেমের চটি

বাগদাদ শহরে আবু কাশেম একজন বড় দোকানদার। তার অনেক টাকা। কিন্তু টাকা থাকলে কি হবে? কাউকেও সে এক পয়সা দেয় না। দোরে ভিখিরী এলে, দোরগোড়া থেকেই কাশেম তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বিপদে পড়ে হয়ত কেউ কিছু চাইল। কোন কথা না বলে সে এক মস্ত বড় লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। লাঠির ভয়েই সে পালিয়ে যায়।

তারপর, কাশেম আবার কৃপণের জাসু। নিজের জন্য সহজে কিছু ব্যয় করে না। এক বেলার খাবার দু'বেলা খায়। বছরে একবার মাত্র স্নান করে। কারণ, বাগদাদ শহরে বাড়ীতে স্নানের কোন ব্যবস্থা নেই। বাইরে হামামে অর্থাৎ সরকারী পুকুরে স্নান করতে হয়। সরকারী পুকুরে স্নান করতে গেলে পয়সা লাগে। স্নানের জন্য পয়সা-ব্যয়! সর্বনাশ! তা হলে ত তার জমানো টাকাকড়ি দু'দিনেই উড়ে যাবে।

পোশাকের বেলায়ও তাই। একটা আলখাল্লা আর পাজামা যে ক'বছর সে পরে আছে, তার ঠিক নেই। আল-খাল্লাটার রং একেবারে জ্বলে গিয়েছে। স্থানে স্থানে নানা রংএর তালি—লাল, নীল, হলদে, সবুজ, শাদা। আর পাজামাটা একদম ময়লা আর ছেঁড়া। তাতেও তালির অন্ত নেই। নানা রঙের তালি।

সব চাইতে চমৎকার তার একজোড়া চটিজুতো। চটি-জোড়া কবে যে কেনা হয়েছিল, তার কোন হিসেব নেই। তবে এতদিনের চটি শুধু নামেই আছে। চটি-জোড়া তালির মধ্যে একেবারে হারিয়ে গিয়েছে। উপরে তালি, নীচে তালি, চটির তলায় চামড়ার ওপর চামড়া লাগানো হয়েছে, গোড়ালিতেও তাই। ফলে চটি-জোড়ার ওজন হয়েছে প্রায় পাঁচ সের। শহরের সব লোক এই চটি চেনে। বিশ্রী বেঢপ্ কোন পুরানো জিনিসের কথা কারো মনে এলে সবারই চোখে প্রথমেই ভেসে ওঠে এই চটি-জোড়া। আবু কাশেমের চটি তাই শহরে সর্বত্র বিখ্যাত।

কিন্তু আবুর তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কারো কোন কথায় সে কান দেয় না। কারো ঠাট্টাবিদ্রূপ সে গায়ে মাখে না। তাই তার পোশাক-আশাকের কোন পরিবর্তন নেই। আবার পয়সা খরচ করে নতুন জুতো কেনবার কথা তার মনেও হয় না। তার একমাত্র চিন্তা, কি করে টাকা রোজগার করা যায়, আর সে টাকা ব্যয় না করে কি করে কেবলই জমানো যায়।

একদিন আবুর কাছে এল এক আতরওলা। সঙ্গে তার আতরভরা অনেকগুলি বোতল। কয়েক দিন শহরে ঘুরে ঘুরে সে মোটেই আতর বিক্রী করতে পারেনি। তার যা টাকা ছিল, সব ফুরিয়ে এসেছে। আর শহরে থাকা চলে না। এদিকে আবু খুব চতুর। ব্যবসা-বাণিজ্যে তার প্রখর বুদ্ধি। আতরওলার অবস্থা বুঝে সে সব আতর খুব সস্তায় কিনে নিল। সে বুঝল, এতে তার মোটা টাকা লাভ হবে। আতরওলা চলে যেতেই

আবু একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতবড় লাভের ব্যবসা অনেকদিন সে করেনি। মনটা খুশীতে ভরে গেল। বহু দিন সে ভালো কোন খাবার খায়নি। আজ তার মনে হল, বেশ করে পেট ভরে খেতে হবে। কিন্তু তার আগে স্নান করাও দরকার। স্নানের পর খেতে খুব আরাম। অনেকদিন স্নান করাও হয় নি। না হয় কিছু খরচই হবে। আতর বেচে যা লাভ করা যাবে, তার কাছে এ খরচটা কিছুই নয়।

আবু চলল হামামের দিকে। গায়ে সেই পোশাক আর পায়ে সেই বিখ্যাত চটি।

পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুটি আবুর দিকে চেয়ে বললে, কোথায় যাচ্ছ, আবু ?

আবু সাধারণতঃ কারো সঙ্গে কোন কথা বলে না। কিন্তু আজ তার মনটায় খুশী উপচে পড়ছে। বন্ধুর কথায় আবু জবাব দিল, ভাই, একটু স্নান সেরে আসি।

বন্ধু আবুকে ভালো করেই চেনে। সে বললে, বেশ ত, স্নান করবার আগে আর একটা কাজ কর। নতুন জামাজুতো কিনে নাও। তোমার পোশাক দেখে যে শহরের লোক হাসে।

আবু গম্ভীর স্বরে বললে, সে দেখা যাবে। এই বলে সে হন হন করে চলে গেল।

সামনেই হামাম। জুতোজোড়া খুলে সে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে গেল। স্নান শেষ করে বেরিয়ে এসেই সে অবাক হয়ে গেল। কোথায় তার জুতা ? তার সেই বিখ্যাত জুতোর জায়গায়

পড়ে আছে এক জোড়া মখমলের নতুন চকচকে চটি জুতো। জুতো-জোড়া দেখে আবু মনে মনে হাসে। এটা নিশ্চয় সেই বন্ধুর কীর্তি। এখন ত পায়ে দি। তারপর দাম দেবার সময় দেখা যাবে। নতুন চটি-জোড়া পায়ে দিয়ে আবু বাড়ী চলে গেল।

এদিকে ত মহাকাণ্ড! সেই নতুন চটি-জোড়া ছিল শহরের কাজী সাহেবের। বাইরে জুতো রেখে তিনিও ঢুকেছিলেন হামামে। স্নান সেরে বার হয়ে দেখেন, জুতা নেই। জুতো গেল কোথায়? খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল ঘরের এক কোণে আবুর জুতো-জোড়া। সবাই একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল। আবুর এত সাহস! নিজের জুতো ছেড়ে রেখে কাজী সাহেবের জুতো চুরি করেছে? কাজী সাহেব রেগে বললেন, কৃপণ চোরটাকে এখুনি ধরে নিয়ে এস।

চারদিকে লোক ছুটল। একটা হৈচৈ পড়ে গেল। আবু সবেমাত্র বাড়ী এসে তালা খুলছে। তালা আর খুলতে হল না। কাজী সাহেবের লোকজন তাকে বেঁধে হাজতে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দিল। তার পরদিন বিচার। কাজী সাহেবই বিচার করছেন। তিনি আবুর কোন কথা শুনলেন না। যে সে জুতো চুরি করেনি, একথা কাজী সাহেবের বিশ্বাস হল না। একটা মোটা টাকা জরিমানা দিয়ে আবু সেবারের মত রেহাই পেল।

আবু বাড়ী ফিরে এল। সে জুতো-জোড়ার উপর ভয়ানক চটে গেল। এই জুতোর জন্যই তার এত দুর্দশা, এই অপমান, এই জরিমানা! এই চটির জন্য আর কি বিপদ হবে কে জানে?

এ পাপ বিদেয় করাই ভালো। এই ভেবে সে জানালা গলিয়ে জুতোজোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিল তাইগ্রিস নদীর জলে। তার বাড়ীর নীচেই এই নদী।

কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দিলে কি হবে? জুতো আবুকে ছাড়ে না। দিন-তিনকের মধ্যে আরও এক কাণ্ড ঘটে গেল। একদল জেলে গেছে নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরতে। জাল ফেলে খানিকক্ষণ পরে তাতে টান দিতেই মনে হল অনেক মাছ পড়েছে, জাল বেশ ভারী ভারী ঠেকছে। তাড়াতাড়ি টানতে গিয়ে জালের খানিকটা ছিঁড়েও গেল। তবুও মনের আনন্দে তারা জাল টানছে, জাল ডাঙ্গায় তুলে তাদের চক্ষুস্থির! মাছ কই? এ ত সেই আবুর চটি। তারা রেগে গিয়ে সেই চটি জোড়া আবুর জানালার দিকে ছুঁড়ে মারল। জানালার ভিতর দিয়ে এসে সে জুতো পড়বি ত পড় একেবারে আতরের শিশিগুলির উপর। ফলে বোতলগুলি ভেঙ্গে গেল, আর সব আতর মেঝেয় গড়িয়ে বন্যার মত বয়ে গেল। আবু একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

এই জুতো নিয়ে এখন সে কি করে। কি করে এই জুতো বিদেয় করে। অনেক ভেবে সে ঠিক করল, জুতো-জোড়া এবার একেবারে বাগানের ভিতর মাটিতে পুঁতে রাখবে, আর দেরী করা নয়। কখন কি বিপদ ঘটবে, বলা যায় না। আবু তাড়াতাড়ি একটা বড় গর্ত করে, তার মধ্যে চটি জোড়া পুঁতে রাখল।

কৃপণ আবুকে প্রতিবেশীরা কেউ দেখতে পারত না। সন্ধ্যে-বেলা অন্ধকারে বাগানের ভেতর আবু গর্ত খুঁড়ছে, এই না দেখে,

প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন ফৌজদারকে খবর দিল। খবর পেয়ে ফৌজদার বুঝল, নিশ্চয়ই আবু বাগানে অনেক ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছে। ফৌজদার তাকে তখুনি ধরে নিয়ে এসে তার লুকানো ধনরত্নের বখরা চেয়ে বসল। আবু পড়ল মহা বিপদে। ফৌজদারকে সে খুব চেনে। সে তাকে সহজে ছাড়বে না। টাকা না পায় ত বেত মারবে। বেতের কথা মনে পড়তেই আবু একেবারে শিউরে উঠল। সে তাকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে ঘরে ফিরে এল।

কিন্তু চটি-জোড়া আর কিছুতেই বাড়ী তো রাখা যায় না। আজ রাতেই এর শেষ করতে হয়ে। এখন একমাত্র উপায় একে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা। যেই কথা সেই কাজ। অনেক কাঠ জড়ো করে সে আগুন জ্বালাল। কিন্তু ভিজে চামড়া আগুনে পুড়বে কেন? এখন উপায়? একে এখন তাড়াতাড়ি কেমন করে শুকানো যায়? আজ রাতে ত শুকুবে না। কাল দিনের বেলা রোদ্দুরে শুকিয়ে নিতে হবে। এই মনে করে সে চটি-জোড়া ছাদের কার্ণিশের ওপর রেখে এল।

দু'মিনিটও হয় নি। এরই মধ্যে রাস্তায় গণ্ডগোল, হৈ চৈ, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছে। আবু চটি-জোড়া রেখে আসবার পরই পাশের বাড়ীর দুটো বেড়াল খেলতে খেলতে জুতোর কাছে এসে পড়েছে। ভিজে চামড়ার গন্ধ পেয়ে বেড়াল দুটো মনে করেছে হয়ত কোন খাওয়ার জিনিস। এই ভেবে যেমনি সেই চটি-জোড়ায় মুখ দিয়েছে অমনি সেটা জুতো-জোড়া কার্ণিশ থেকে একেবারে নীচে পড়ে গেল। তখন সেই পথ দিয়ে

যাচ্ছিল এক বুড়ি। চটিজোড়া পড়ল তারই মাথায়। বুড়ি ত চীৎকার করে একেবারে অজ্ঞান। চীৎকার শুনে পাশের বাড়ীর লোকজন সব ছুটে এল, ছুটে এল রাস্তার সব লোক। সবার মুখেই এক কথা—বুড়ীকে খুন করল কে? কোথায় সে খুনে?

কে খুনী, তা বার করতে অবশ্য বেশী দেরী হল না, বুড়ীর মাথার কাছেই পড়ে আছে আবুর সেই বিখ্যাত চটি। আর এটা ত আবুরই বাড়ী। সুতরাং আবুই যে বুড়ীকে খুন করেছে, এতে কারো কোন সন্দেহ রইল না। এবার সবাই মিলে এল আবুর বাড়ীর দুয়োরে। দুয়োর খুলে দেবার জন্য চলল ধাক্কার পর ধাক্কা। এই খুনের জন্য তারা নিজেরাই আবুকে শাস্তি দেবে। সবাই একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে।

আবু ত ভয়ে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে। এবার বুঝি জীবনটাই যায়। আবু তাড়াতাড়ি খিড়কির দোর খুলে একেবারে কাজী সাহেবের পায়ের উপর কেঁদে পড়ে বললে, হুজুর, আমায় বাঁচান। এই সর্বনেশে চটিজোড়া থেকে আমায় রক্ষা করুন। বিপদের পর বিপদ ঘটাচ্ছে এই চটিজোড়া। এবার আপনি শহরময় ঘোষণা করে দিন যে, এই জুতো যে অপরাধ করবে, তার জন্য আমি দায়ী হব না। আপনি যদি এ অনুগ্রহ না করেন, হুজুর, তা হলে আমার আর বাঁচার উপায় নেই। আমার জীবনমরণ এখন আপনার হাতে।

আবুর করুণ আবেদন শুনে কাজী সাহেব হাসলেন। কৃপণ আবুর জন্য তাঁর একটু দুঃখও যে না হল, তা নয়। তাই আবুর কথা তিনি শহরময় ঘোষণা করে দিলেন।

নীলুর বড়াই

চৌদ্দ বছরের ছেলে নীলু। কিন্তু কথা বলে যেন চব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে। গল্প, গল্প, কেবল গল্প। এ গল্পের আর শেষ নেই।

কয়েকজন ছেলে এক সঙ্গে হয়েছে কি, নীলু বলতে শুরু করেছে—সেবার কি হ'ল জানিস। শীতকাল বেড়াতে গিয়েছি মামার বাড়ী। চারদিকে শুধু কড়াইশুঁটি আর কড়াইশুঁটি। সব মাঠেই কড়াইশুঁটি। কেবল কড়াই-শুঁটির চাষ।

নন্তুর বয়স বছর বারো। সেও শুনছিল নীলুর গল্প। সে হঠাৎ বলে বসল, আচ্ছা নীলুদা, তোমার মামারা বুঝি শুধু কড়াইশুঁটি খেয়েই বেঁচে থাকেন।

নীলু তখুনি জবাব দিল, কেবল কড়াইশুঁটি খেয়ে কেউ থাকতে পারে নাকি! আরে মামার বাড়ীর দেশে আছে একটা মস্ত নদী। সে নদীতে হাজার হাজার নৌকা। সেই সব নৌকা করে ধানচাল-তরিতরকারী আসে বিদেশ থেকে। তারপর শোন। কি বলছিলুম, হ্যাঁ, আর কেবল আখের গাছ। রসগোল্লার রস ফেলে আখের রস আমরা খেতুম। তবে তোদের চুপি চুপি বলে রাখি, এত রস খেতে আমাদের বাবা-মা দেবেন কেন। আমরা খেতুম চুরি করে। এখন, সে চুরির গল্পই বলছি।

আমি আর আমার এক মামাতো ভাই একদিন বেরিয়েছি ভোর রাতে আখ-ক্ষেতের দিকে।

আমরা এক ঘরেই শুতুম। রাত ঠিক করতে পারিনি। মনে হল, ভোর হয়েছে। আস্তে আস্তে সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ত বার হলুম। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হল, ভোর হয়নি। ভোর হতে তখনো অনেক দেরী। বার হয়ে পড়েছি। এখন আর কি করা যাবে। দু'জনে এগিয়ে চললুম সোজা পথে নয়, একটু ঘুর পথে। সোজা পথে যে ধরা পড়বার ভয়। কেউ যদি বাড়ী থেকে আমাদের দেখে ফেলে, তবে আর রক্ষা নেই। বেত ভাঙবে আমাদের পিঠে। তাই একটু সাবধানে যাচ্ছি।

জানোই ত আমার ভয়ডর কিচ্ছু নেই। মামাতো-ভাইটা আমার একটু ভীতু। খানিকটা হাঁটে আবার খানিকটা দাঁড়ায়। ভূতের ভয় ত তার আছেই। তারপরে দেশটা আবার জঙ্গলা। বাঘটাঘ বেরোয়। গরুবাছুর-ছাগলভেড়া যা পায়, তাই নিয়ে যায়। তাই রাতে ত কথাই নেই, সন্ধ্যের পর আর কেউ সহজে বাড়ী থেকে বার হয় না। আমি দেখলুম, ওকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা বড় বিপদ, কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। হয়ত ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। তাই মামাতো-ভাইকে আর আমি সঙ্গে নিলুম না। বাড়ীতে রেখে এলুম। সে ত বেঁচে গেল। সদর দরজা বন্ধ করে সে একেবারে দেছুট।

আমি আবার পথ ধরলুম। সেই জঙ্গলা পথ। সে পথ ধরে খানিক দূর গেলেই বাঁশবন। বেশ বড় বড় সরু সরু বাঁশ।

কিন্তু কেউ মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে নেই। সবার আগা নুইয়ে পড়েছে। শেষ রাতের আবছা অন্ধকার। এই আবছা অন্ধকারে বাঁশগুলিকে ভূতের মত দেখায়। অন্য কেউ হলে হয়ত চেঁচিয়েই উঠত। কিন্তু আমি ত জানি এগুলো কি। তাই এগোচ্ছি ধীরে ধীরে। অন্ধকারে পথ ভালো করে দেখা যায় না।

তবে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলনা। সামনে যা দেখলুম··· নীলু চুপ করে গেল।

সবাই চুপ করে শুনছিল। কারো মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। উত্তেজনায় সবাই কাঁপছে। প্রথমে মান্তু চোখ গোল করে বললে, কি দেখলে, নীলুদা···ভূত? সত্য প্রশ্ন করল, পেত্নী? ভুলু জিজ্ঞেস করল, রাক্ষস?

নীলুর মুখে আর কথা নেই। একেবারে বোবা। এবার সবাই নীলুকে ঠেলাঠেলি শুরু করল। কি দেখেছিল বলবার জন্য বিরক্ত করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে নীলু বললে—ভূতও নয়, পেত্নীও নয়, রাক্ষসও নয়···। সবাই এবার একসঙ্গে প্রশ্ন করল, তবে···?

নীলু আবার বলতে আরম্ভ করল, সেটা যে কি, তা ভাই, আমিও আজও জানতে পারিনি। এখনো মনে হলে শরীর শিউরে ওঠে। দেখলুম, একটা অদ্ভুত জীব। মস্ত বড় মাথা। মাথায় দুটো শিং। নাকটা থ্যাবরা। চোখ দুটো গোল গোল। মস্ত-বড় গোঁফ। বড় বড় দাঁত। হাত দুটো বাঁদরের মাতা আর পা দুটো গাধার। এ মূর্তি দেখে আমিত আর নেই। কি করি?

চেঁচালে হয়ত বিপদ হবে। দৌড় দিয়েও রক্ষা নেই। অমনি একলাফে ধরে ফেলবে।

যারা শুনছিল, তারা একসঙ্গে প্রশ্ন করল, তারপর?

তারপর—আবার শুরু করল নীলু, কোন উপায় দেখছিনে বাঁচবার। এমন সময় কয়েকবার খুব জোর বাতাস বইল। তোমরা জানো জোরে বাতাস বইলে বাঁশ গাছের পলকা ডগাগুলি নুয়ে পড়ে আবার উঠে যায়। আমার কাছাকাছি সেই একটা বাঁশের ডগা এসে পড়েছে। আমি সেটাকে ধরে ফেললুম আর সড়াৎ করে একেবারে আকাশে। কিন্তু মানুষের ভার একটা পলকা ডগা সইতে পারবে কেন। ভেঙ্গে গেল একেবারে মচাৎ করে, আর গিয়ে পড়লুম, সেই ভীষণ জীবটার কাঁধের ওপর। সে চমকে উঠে একেবারে দৌড়। আমি ভয়ে ভয়ে তার শিং দুটো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলুম। সে ছুটছে বনজঙ্গল পেরিয়ে। আমি তার কাঁধে। গা ছড়ে গেল। পা ছড়ে গেল। একেবারে রক্তারক্তিকাণ্ড। খানিক দূর এগিয়েই একটা বড় বটগাছ। বটগাছটার কাছাকাছি আসতেই আমি শিং ছেড়ে দু'হাতে ডাল আঁকড়ে ধরলুম। ছাড়া পেয়ে সে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমি বাদুড়ের মত ঝুলতে লাগলুম। অনেক কষ্টে কোনমতে ডালটার ওপর উঠে বসে হাঁফ ছাড়লুম। তারপর আমি আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এলুম। তখন ভোর হয়েছে। পাখীরা ডাকতে আরম্ভ করেছে।

মামার বাড়ী এসে একেবারে শুয়ে পড়লুম।

গল্প শেষ হল। যারা শুনছিল তারা খুব খুশী হল না। নীলুর সব কথা সত্যি কিনা কে জানে। অতটুকু ছেলের এত সাহস! তা আবার শেষ রাতে!

নন্তু, মান্তু, ভুলু, টুলু সবাই চলে গেল, কিন্তু বাড়ী গেল না। তারা নদীর ধারে বটগাছটার কাছে এসে বসে পড়ল।

আজ একটা নতুন গল্প তারা শুনেছে। এর আগে নীলুর কত রোমাঞ্চকর কাহিনী তারা শুনেছে তার শেষ নেই। নীলু তরাই অঞ্চলে সাপের মুখে পড়েছে, সুন্দরবনে দাদার সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়েছে, কুমীরের মুখ থেকে বের হয়ে এসেছে, এমন কত কি। গাঁয়ের সব ছেলে নীলুর কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু একটা দল আছে যারা নীলুকে দেবতার মত মানে। সে দলটা বড় কম নয়।

নন্তু বললে, নীলুর কথা সত্যি কিনা পরীক্ষা করতে হবে। তা নইলে ত গাঁয়ে টেকা দায়। ওর কোন কথা আমি বিশ্বাস করি নে। কেবল মুখেই বড়াই।

সবাই মিলে একটা মতলব ঠিক করে ফেলল।

কয়েকদিন পরের কথা।

এগাঁয়ের হরিদার বিয়ে। পাশের গাঁয়ে কনের বাড়ী। বিয়েতে সবাই যাবে। ছেলের দলের ত মহাস্ফূর্তি। বিয়ে বাড়ীর নেমতন্ন খাবে, আর খাবে পোলাও, লুচি, মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি। সন্ধ্যের সময় বিয়ের লগ্ন। নেমন্তন্নের পর তাড়াতাড়িই সবাই ফিরতে পারবে।

নীলু ত দলবল নিয়ে যাচ্ছে বিয়েবাড়ী।

নেমতন্ন খাবার পর মান্তু, নন্তু, ভুলু, টুলুরা আগেই বেরিয়ে গেল। খানিক পরই নীলু বার হল তার দলবল নিয়ে। রাত হয়েছে। দু'গাঁয়ের মধ্যে একটা মাঠ। মাঠের মাঝখানে একটা বড় বট গাছ। গাছটার ডালপালা অনেক। তাই গাছটার নীচে একটু অন্ধকার।

নীলু এগিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে খানিক দূরে তার সঙ্গীরা। নীলুর ত কোন ভয়ডর নেই। সবাই সে কথা জানে। আর নীলুকেও তার সাহস দেখাতে হবে বন্ধুদের কাছে।

কিন্তু বটগাছটার কাছাকাছি আসতেই এক কাণ্ড ঘটে গেল। নীলু দেখল একটা জন্তু। বড় ছুটো শিং; লম্বা কান, বড় বড় চোখ, গায়ে ডোরাকাটা হলদে রং। নীলু কাছে আসতেই জন্তুটা হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

নীলু ত এক বিরাট চীৎকার দিয়ে একেবারে অজ্ঞান! একেবারে মাটিতে পড়ে গেল। আর মুখ দিয়ে বার হতে লাগল একটা গোঁ-গোঁ-গোঁ শব্দ। নীলুর বন্ধুরা ভয়ে আবার বিয়ে বাড়ীর দিকে একেবারে ছুটল। ছুটে গিয়ে তারা হাঁপাতে হাঁপাতে যা বললে, তাতে বিয়ে বাড়ীতে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল। কারুর হাতে লাঠি, কারু হাতে সড়কি। অনেকের হাতে আবার দা, কুড়ুল। সবাই এসে দেখে নীলু মাটিতে পড়ে আছে। তখনো জ্ঞান হয় নি। একদল তার চোখে মুখে জল দিতে শুরু করল। আর একদল

জন্তুটার খোঁজ করতে লেগে গেল। কিন্তু কোথায় জন্তু ? খুজে পাওয়া গেল না। তবু সবাই তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। খানিক দূর গিয়েই দেখা গেল একটা মুখোস আর একটা ডোরাকাটা লম্বা জামা পড়ে আছে।

আরে এ যে যাত্রার দলের পোশাক। এটা এল কোত্থেকে। তবে জন্তুটন্তু কিছু নয়। নীলুর মত বীরপুরুষ মুখোস দেখেই অজ্ঞান! ইতিমধ্যে মান্তু-নন্তুরাও এসে গিয়েছে। তাদের মুখে হাসি। যারা বয়সে বড়, একদল ছেলের মুখে হাসি দেখে, তাদের কেমন সন্দেহ হল। মান্তু-নন্তুকে তারা ডাকল। ওরা এগিয়ে এল। কিন্তু হাসি আর থামে না।

একজন জিজ্ঞাসা করল, আরে তোরা হাসছিস কেন ?

মান্তু জবাব দেয়, নন্তু জানে।

নন্তু জানে ? তবে ত এরা সবই জানে। একটু চাপ দিতেই সব কথা বার হল। মান্তুরা নীলুর সাহস পরীক্ষা করবার জন্য আগেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। নন্তু পড়েছিল একটা মুখোস আর এই পোষাকটা। এই মুখোস আর পোশাক পড়ে একটা হুঙ্কার দিতেই বীরপুরুস নীলু একেবারে অজ্ঞান।

এবার সবাই হেসে উঠল। নীলুর ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে, শুনতে পেয়েছে মান্তুদের কাণ্ড।

এর পরে বহুদিন আর নীলুকে গাঁয়ে দেখা যায়নি।

শোনা গেল, সে মামার বাড়ীর স্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। দেশে আর শীগগির আসছে না।

লাল ছোরা

বেলা ন'টা।

বাবা বাইরের ঘরে বসে আছেন। আফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত। মণ্টুও ব্যাগ কাঁধে করে স্কুলে যাবে। হঠাৎ সে বাবার কাছে এসে বললে, বাবা তোমার বন্দুকটা একবার দেবে? আমি শিকার করব।

বাবা হেসে বললেন, দেব, দেব। আগে বড় হও, বন্দুক ছুঁড়তে শেখ। তারপর বন্দুক পাবে।

মণ্টু ছাড়বার পাত্র নয়। সে জবাব দিল, এইত আমি বড় হয়েছি। ক্লাশ ফাইভে পড়ি। দাও না একবার বন্দুকটা।

বাবার তখন খুব তাড়াতাড়ি। ছেলেকে থামাবার জন্য বললেন, আচ্ছা দেখি। আফিস থেকে ত ফিরে আসি।

মণ্টু লাফাতে লাফাতে বের হয়ে গেল। বাবা তাকে বন্দুক দেবেন। ছোট বোন মিণ্টু বাইরে দাঁড়িয়ে দাদার আর বাবার কথা শুনছিল। মণ্টুর চাইতে সে মাত্র এক বছরের ছোট। কিন্তু ছোট হলে কি হবে। মেয়েদের স্কুলে সেও পড়ে ক্লাশ ফাইভে। বড় ভাই বলে মণ্টুকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। মণ্টু বার হয়ে যেতেই মিণ্টু বাবাকে বললে, আমি শুনেছি তোমাদের কথা। তুমি দাদাকে বন্দুক দেবে? আর আমাকে?

বন্দুকটার ওপর মিণ্টুরও লোভ কম নয়।

বাবা হেসে বললেন, দূর, তাই কি দি। অমনিই বললুম। বড় হলে তোমাদের দু'জনকেই বন্দুক দেব। এখন স্কুলে যাও।

মিণ্টু খুশী হয়ে চলে গেল। সে বন্দুক পা'ক আর না পা'ক মণ্টু ত পাবে না।

মণ্টু স্কুল থেকে ফিরে এসেই মাকে জিজ্ঞাসা করে, মা, বাবা আফিস থেকে কখন ফিরবেন ?

ঠিক এসময় মিণ্টুও এসে দাঁড়াল। সেও সবেমাত্র স্কুল থেকে ফিরেছে। দাদার কথা শুনে বললে, বাবা ফিরলে কি হবে ? সে গুড়ে বালি।

ছেলেমেয়ের কথা মা ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাই তিনি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, কি হয়েছে ? মণ্টু বললে, বাবা আমাকে তাঁর বন্দুক দেবেন, বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টু বললে, না, মা, দেবেন না। বাবা এমনি এমনি বলেছেন।

ব্যাপারটা এবার বুঝতে পেরে মা ছেলেমেয়েকে বললেন, জল খাবার খেয়ে এবার তোমরা খেলতে যাও। তার পর যা হবার হবে।

সন্ধ্যেবেলা। মণ্টু আর মিণ্টু পড়তে বসেছে। মণ্টুর কাছে বই খোলা। পড়ায় তার মন নেই। সে কেবল ভাবছে বন্দুকের কথা। বাবার বন্দুক নিয়ে দূর বনে শিকার করতে যাবে। শিকার করবে পাখী, খরগোস, বনবেড়াল। তার পর যখন আরও বড় হবে, তখন যাবে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে শিকার করবে বাঘ, ভালুক, কুমীর। একথা মনে ভাবতেই কত

আনন্দ! কত মজা! রয়েল বেঙ্গল টাইগার। শুনলেই যে গা শিউরে ওঠে।

মণ্টুর মন আর বইয়ে নেই। কেবল তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে শিকারের ছবি।

এমন সময় তার বাবার সাড়া পাওয়া গেল। মণ্টু তাড়াতাড়ি উঠে বাবার কাছে ছুটে গেল। আবার সেই বন্দুকের কথা। বাবা বললেন, মণ্টু আরও বড় হয়ে যখন কলেজে পড়বে, তখন পাবে বন্দুক।

মুখ কালো করে মণ্টু পড়ার ঘরে চলে এল।

এরপর কয়েক দিন কেটে গেল। মণ্টু আর বন্দুকের জন্য আবদার করে না।

কিন্তু তার ভাবগতিক ভালো দেখা যাচ্ছেনা। কারু সঙ্গে সে বেশী কথা বলে না। এমনকি মিণ্টুর সঙ্গেও নয়। সব সময় যেন সে কি ভাবছে আর কাগজকলম নিয়ে কি লিখছে। মিণ্টু মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছে কিন্তু দাদার ধমক খেয়ে বারে বারে ফিরে গিয়েছে। মিণ্টুর সন্দেহ, দাদা কিছু একটা করবার ফন্দি আঁটছে। কিন্তু সেটা যে কি, তা সে ঠিক ধরতে পারছে না।

একদিন সকালবেলা। মণ্টুর বাবা চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। তার পাশে টেবিলের উপর এক তাড়া চিঠি। খবরের কাগজ রেখে দিয়ে তিনি চিঠি খুলে পড়তে শুরু করলেন। তার মধ্যে পেলেন একখানা চিঠি। শাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা!

কাগজটার উপরের দিকে একটা লাল রংএর ছোরা আঁকা। আর তার নীচে লেখা—

তোমার ছেলেকে বন্দুক দাও। বন্দুক না দিলে বিপদ।

বাবা এই ভয়ঙ্কর চিঠি পড়ে কিন্তু মোটেই কিন্তু চিন্তিত হলেন না। বরং তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তিনদিন পরে তিনি আবার একটা চিঠি পেলেন। একই ধরনের চিঠি। লাল কালিতে লেখা। উপরে আঁকা সেই লাল ছোরা। এবার লেখা আছে—

বন্দুক এখনো পাওয়া যায়নি ! সাবধান !

সেখানাও তিনি পকেটে রেখে দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলেন। শোবার ঘরে বসে মণ্টু ও মিণ্টু পড়ছে। মণ্টু-মিণ্টুর মা তাদের পড়া দেখিয়ে দিচ্ছেন।

বাবা ঘরে ঢুকে চিঠি দু'খানা মাকে দেখালেন। তিনি দু'খানা দেখে একটু মুচকি হাসলেন। চিঠিখানা মিণ্টুর হাতে দিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, মিন্টি-মা, বলো ত এখন কি করি। এমন ভয়ানক চিঠি পেয়ে ত চুপ করে আর থাকা যায় না।

মণ্টুর মাথা ক্রমে নীচু হয়ে আসছে। নাকটা প্রায় এসে ঠেকেছে বইয়ের সঙ্গে। এমন সময় মিন্টি বললে, বাবা, পুলিশে খবর দাও। এ নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত-সমিতির কাজ।

তাই করব।—বলে বাবা উঠে চলে গেলেন।

তারপর সত্যিই একদিন সকালে এক দারোগা এসে হাজির হল মণ্টুদের বাড়ী। দারোগার মাথায় টুপি। পরনে খাকী পোশাক।

কোমরে রিভলবার গোঁজা। মণ্টুর বাবার বসবার ঘরে ঢুকেই সে হাঁক দিল, মণ্টুবাবু বাড়ী আছেন।

বাড়ীর চাকর মণ্টুকে ডেকে নিয়ে এল। দারোগা দেখেই ত মণ্টু অবাক। তার মুখ শুকিয়ে গেল। পা দুটো তার থর থর করে কাঁপতে লাগল। মিন্টিও দাদার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারও ভয় কম নয়।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, মণ্টু তুমি কি করেছ? পুলিশ তোমাকে ধরতে এল কেন?

মণ্টু জবাব দিল, না আমিত কিছুই করিনি।

এবার দারোগা মণ্টুর দিকে চেয়ে বললে, তোমার নামই তা হলে মণ্টু।

মণ্টু জবাব দিল, হ্যাঁ।

দারোগা তার পকেটে হাত দিয়ে গম্ভীর ভাবে মণ্টুকে বললে, আমি একটা ভয়ানক দলের খোঁজ করছি। লাল ছোরার দল। আমার মনে হয় মণ্টুবাবু এ দল সম্বন্ধে কিছু জানে।

একথা শুনে মিন্টুর চোখ ত একেবারে গোল। সে ধীরে ধীরে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

মণ্টু তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেয়েছে, তার ভয় কেটে গিয়েছে। গোয়েন্দা গল্পের মত ব্যাপারটা ঠিক ঘটে যাচ্ছে। এই ধরনের গোয়েন্দা গল্পের কথা তার মনে পড়ল। এবার আর ভয় নয়। সে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। গোয়েন্দাটাকে জব্দ করতে হবে।

মণ্টু ভাবতে লাগল। তার পড়া গোয়েন্দা গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল তারপর মণ্টু শান্ত গলায় দারোগাকে বললে, হয়ত কিছু খোঁজ আমি দিতে পারি। আপনি আমার সঙ্গে উপরে আমার পড়ার ঘরে আসুন।

চল—বলে দারোগা অগ্রসর হল।

দারোগা ও মণ্টু উপরে উঠে গেল। বাবা, মা, মিণ্টু বাইরের ঘরেই রয়ে গেল।

ততক্ষণ দারোগা আর মণ্টু সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির সামনেই একটা ছোট ঘর। এখানে বসেই মণ্টু ও মিণ্টু পড়ে। ঘরের মাত্র একটি দরজা। এই দরজা দিয়ে দু'জনেই ঘরে ঢুকল। মণ্টু দারোগাকে বললে, আপনি এই চেয়ারটায় বসুন, আপনাকে দেখাবার জন্য একটা জিনিস নিয়ে আসছি।

দারোগা হেসে চেয়ারটায় বসে পড়ল। মণ্টু মুচকি হেসে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার হয়ে, দরজার শিকল তুলে দিয়ে বললে, কেমন জব্দ গোয়েন্দা সাহেব। এবার যে ধরা পড়ে গেলে।

ভিতর থেকে দারোগা বললে দরজা খোল, মণ্টুবাবু। নইলে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব। আমি বুঝতে পারছি, তুমিই লাল্টু ছোরার দলের নেতা।

মণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, কখনো নয়। আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন। নইলে বিপদে পড়বেন।

ইতিমধ্যেই সবাই উপরে উঠে এসেছে। ভিড় করে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে।

এবার ভিতর থেকে দারোগা বললে, আচ্ছা, আমি তোমায় ছেড়ে দিলুম। এবার দরজা খোল।

মণ্টু উত্তর দিল আপনাকে আমার বাবার বন্দুক পাইয়ে দিতে হবে।

ভিতর থেকে দারোগা বললে, তা হবে না। আমি তোমার বুদ্ধির কাছে হেরে গিয়েছি। আমার রিভলবারটাই আমি তোমাকে দেব। তুমি দরজা খুলে দাও।

মণ্টু এবার আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি শিকল খুলে দিল। কিন্তু কোথায় দারোগা! তার টুপি কই? এ যে বঙ্কু মামার টাক। বঙ্কুমামা!

মণ্টু হকচকিয়ে গেল। মিণ্টু হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মাও হাসছেন।

বঙ্কুমামা তার রিভলবারটা মণ্টুর কাছে এগিয়ে দিল। মণ্টু অস্ত্রটা হাতে নিয়ে দেখল, সেটা আসল নয়, নকল।

তবুও তার আনন্দ দেখে কে। রিভলবার পেয়ে সে একেবারে লাফিয়ে উঠল।

মিণ্টু বললে, আমি ভেবেছিলুম, সত্যি বুঝি দারোগা। ওমা, এ যে বঙ্কুমামা।

মিণ্টু এবার বঙ্কুমামার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, দাদাকে তুমি রিভলবার দিয়েছ। আমায় কি দেবে?

বঙ্কুমামা হেসে বললে, তোমাকে? দাদার লাল ছোরার দলে যোগ দাওনি বলে, তোমাকে দিলুম ঝরনা কলম। এই নাও।

মিণ্টুর মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

খরগোশের দেশবেড়ানো

এক বনের মধ্যে থাকে বাচ্চা খরগোশ আর তার মা। খরগোশের বন্ধু আছে, বান্ধব আছে। তাদের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে পাঠশালায় যায়। পাঠশালে গুরুমশায়ের বেত আর বাড়ীতে মার বকুনি তার ভালো লাগে না। সে চায় নাচতে, গাইতে আর ছড়া কাটতে। কিন্তু তা কি করার জো আছে ? চার দিকেই শাসন আর শাসন।

বাড়ী থাকতে আর ভালো লাগে না। বাইরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। এ বনে যা আছে, তা তার কাছে পুরানো হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে কত বন, কত গাছপালা, কত ফুল, কত ফল, কত রকমের জীবজন্তু। আর চলবার পথই বা কত! কিছুই তার দেখা হল না। আরে বই পড়েই কি সব জানা যায় ? না কেবল শুনে শুনে সব শেখা যায় ?

একদিন বাচ্চা খরগোশটা মাকে বললে, মা-মনি, তোমার কেবল পড়া আর পড়া। এত পড়তে কি ভালো লাগে ? গুরু-মশাই কি বলেন, জানো। তিনি বলেন দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালে ঢের বেশী শেখা যায়।

খরগোশের মা ছেলের কথা শুনে হাসল, বললে, বেশ ত, পাঠশালা তো এখন ছুটি। বেড়িয়েই এস না আজ। তবে নতুন কিছু শিখে আসতে হবে। যদি শিখতে না পার, তবে কানটি

আচ্ছা করে মলে দেব, আর রাতের খাওয়া বন্ধ থাকবে। তবে পুরস্কার পাবে, নতুন কিছু শিখতে পারলে।

মায়ের মুখে এমন কথা! খরগোশটা তখুনি আনন্দে খানিকটা নেচে নিল। তারপর ঝোপজঙ্গল গাছপালার ভেতর দিয়ে তর তর করে এগিয়ে চলল। কোথায় যাবে তার ঠিক নাই। কোথায় গিয়ে উঠবে, তার ঠিকানা নেই। নেই ত নেই। তাতে আর হয়েছি কি! সে চলতে লাগল। চলতে চলতে দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যে হল। তবুও ফেরবার নাম নেই।

রাত হল। সে দিন আবার পূর্ণিমা। রূপোর বড় একটা থালার মতো আকাশে চাঁদ উঠেছে। জোছনায় চার দিক ধব ধব করছে। আরো খানিক দূরে এগিয়ে এসে সে দেখে একটা বড় কপিক্ষেত। ক্ষেত-ভরতি বাঁধা কপি আর ফুল কপি। কেউ কোথাও নেই। কচি কচি কপিপাতার কি সুন্দর গন্ধ। সারাদিন কিচ্ছু খাওয়া হয়নি। খিদেও পেয়েছে খুব। মহাখুশীমনে তখুনি সে কচি কচি কপি পাতা কুর কুর কুর করে খেতে শুরু করে দিল।

পেটটা বেশ ভরে এসেছে। চাঁদের আলোয় এবার মনটা বেশ উথলে উঠল। বাচ্চা খরগোশটা গাইতে জানত আর পারত ছড়া তৈরী করতে। কিন্তু বাড়ীতে মা আর পাঠশালে গুরুমশায়ের ভয়ে চুপচাপ থাকত। পড়া ছেড়ে ছড়া বলা? আবার গান?

আজ ত আর মা কাছে নেই। গুরুমশাইও নেই। ভাবনা

কি? খরগোশ মুখে মুখে একটা ছড়া তৈরী করে গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিল—

তাইরে নাইরে নাইরে না, কাছাকাছি নেইক মা।
পাঠশালাটা অনেক দূর, নাচের তালে লাগাও সুর।
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল্।
জগৎ কবে দেখবি বল?
তাইরে নাইরে নাইরে না
আমি চল্‌ছি, চলছে পা।

হা-হা-হা-হা—। কে হেসে উঠল না? খরগোশ হঠাৎ চমকে গেল। গান থেমে গেল। ভয়ে ভয়ে সে একটু দূরেই সরে এল। না, অজানা দেশে একটু সাবধান হওয়াই ভালো। সে দূরে চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে পিট্ পিট্ করে তাকাতে লাগল।

আরে এ যে একটা ইঁদুর!

সত্যি ইঁদুরটাই হাসছিল। হাসছিল, খরগোশের গান শুনে। ইঁদুর খরগোশের কাছাকাছি এসে বলল, বেশ ত গাইতে পার, ভায়া। ছড়াও বানাতে পার দেখছি। আমি তোমার মতই একজন খুঁজছিলুম। আমাদের একটা গানের দল আছে। এই মাঠটার ওই কোনে দলটা বসে। গান সবাই জানে। কিন্তু গানে কোন কথা নেই। শুধু সুর ভাঁজলে কি গান হয়? কথা না থাকলে কি গান জমে? তুমি আমাদের গানের দলে এস। তুমিই গান তৈরী করবে।

গানের দল ? ইঁদুরের কথা শুনে খরগোশের কান দু'টো খাড়া হয়ে উঠল। এ একটা নতুন কথা বটে। এমনটা ত কখখনো শোনা যায় নি।

ইঁদুর আমায় বললে, আমাদের দলে অনেক গাইয়ে আছে, ব্যাঙ, পেঁচা, ঝিঁঝি পোকা, আর কাক। বাজনা বাজায় কাঠঠোকরা।

খরগোশ বললে, বা, বেশত।

ইঁদুর বললে, বেশ বললে কি হবে। গানে যে কোন কথা নেই।

খরগোশ বললে, ও বুঝেছি—

ব্যাঙের শুধু ঘেঙর ঘেঙ,
নেইক কথা নেইক মানে,
পেঁচায় জানে একটি কথা,
সেই কথারই সুর টানে।
কাকের কথা বলব কিবা—
যেমন গলা তেমনি গান ;
ঝিঁ ঝিঁ পোকাই দল রেখেছে,
মিষ্টি সুরে রাখছে মান।

ইঁদুর ত খুশীতে একেবারে ডগমগ। খরগোশকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। এখখুনি তাকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপরেই ইঁদুর কি মনে করে বললে, আচ্ছা, তুমি এগোও। গানের আসরে ত খাবার চাই। আমি কিছু ধানচালডাল নিয়ে আসি। তুমি কপিপাতা নিয়ে চল। এই বলে ইঁদুর চলে গেল।

৪

খরগোশ ইচ্ছামত কপিপাতা কুড়িয়ে নিল। তারপর সেই বোঝা ঘাড়ে করে গান গাইতে গাইতে চলতে লাগল,—

গানের কথা গাঁথব আমি,
সবাই ধরবে তান।
কথায় কথায়, সুরে সুরে,
জাগবে খুশীর বান।
আমিই হব দলের সেরা,
সবাই মোরে মানবে,
পাঠশালার এ ছোট ছেলে,
কে বা তা আর জানবে।

কে হে, কে গায়। খরগোশের কানের কাছেই কার ভরাট গলার ডাক।

আরে এ যে ব্যাঙ ভায়া।

ব্যাঙ বললে, চমৎকার গাইতে পার ত। চল না আমার সঙ্গে। আমি যাচ্ছি ইঁদুরের গানের আসরে। সঙ্গে আছে অনেক পোকামাকড়। খেতে হবে ত।

খরগোশ বললে, চল। আমি ত যাচ্ছি সেখানে। তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে ত।

ব্যাঙ এগোয় থপ্ থপ্ করে। তাড়াতাড়ি চলতে পারে না। তবুও প্রাণপণে সে এগিয়ে চলল। থামল না কোথাও, আনন্দে শরীরের কষ্ট ভুলে গেল। কেবল জোরে জোরে চলার শব্দ হচ্ছে—থপ থপ থপ।

দুজনেই এসে দেখে, ইঁদুর এসে গিয়েছে। তার সঙ্গে আরও অনেক ইঁদুর। আর এসেছে পেঁচা ও ব্যাঙের দল, কাকের দল। আসর একেবারে জমজমাট। গান তখনও শুরু হয়নি, লম্বা লম্বা ঠোঁট নিয়ে একধারে বসে আছে কাঠঠোকরার দল। গান শুরু হলেই বাজনা বাজাবে।

গান শুরু হবে কি করে! গানের কথা চাই ত?

ইঁদুর এগিয়ে এল। খরগোশকে আদর করে সভার মাঝখানে বসিয়ে বললে, আর ভাবনা নেই। খরগোশ গানের কথা দেবে আর আমরা সে কথা দিয়ে গান গাইব।

সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। কি মজা, কি মজা। গান আজ জমবে ভালো।

এদিকে খরগোশের বুকটা ফুলে উঠেছে অহঙ্কারে। এত সম্মান! মা যদি আজ কাছে থাকত, তা হলে ছেলেকে কোলে করেই নাচতে শুরু করে দিত।

গানের আসর বসে গেল। সবাই বসল ঘন হয়ে। মধ্যখানে খরগোশ। প্রথমে গাইছে সে, তার পর আর সকলে! সঙ্গে সঙ্গে কাঠঠোকরা তাল ঠুকছে। ক্রমে গান জমে উঠল। খরগোশের গানের সুরে সুর মিলিয়ে সবাই গানের দোহারি করতে লাগল। পেঁচার সুর সবার উপরে।

হুই ও…হুইও…হো,
কেরে তুই মারবি ছো?

চোখ যে সব দেখতে পায়,
আড়ালে কে আছে কে যে যায়!
আজ ধরার নেই জো,
হুইও হুইও হো।

তারপর শোনা যাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার গান।

ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ—
সবাই মোদের দেখছ কি?
আড়ালে ভয়ে লুকিয়ে যাই,
আঁধার হলে গান যে গাই
আজকে কারো ভয় নাই
ভাইকে ভাইয়ে মারবে কি?
ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ।

এবার শুরু হল ব্যাঙের গান—

পুকুরের জলে নই
কাদার ভেতর নই
এত আলো, এত আলো।
সাঁতার দেব না আর, শুধু গান এন্তার
এই ভালো, এই ভালো।

এবারে কাকের দল গেয়ে উঠল—

কা—কা—কা—
আমরা সবাই বন্ধু রে ভাই
কা—কা—কা।

নাচব মোরা গাইব গান
জোর গলাতে তুলব তান
সব আপন সব সমান
কা—কা—কা।

গানের আসরে খরগোশের জয়-জয়-কার। সবাই যাকে ঘিরে নাচতে শুরু করে দিল।

তারপর আসর ভেঙ্গে গেল।

খরগোশ তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ছুটে গেল। মাকে সব বলতে হবে। কেমন গান সে তৈরী করেছে। কেমন গান সে গেয়েছে। নিজের চেষ্টায় আজ সে কত বড়। কত তার মান। সবাই করছে তার প্রশংসা।

ভাগ্যিস সে একা বেরিয়েছিল। তাইত নিজের শক্তির পরিচয় পেল।

বাচ্চার জন্য মা দোরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর মা শুনল সব কথা। শুনে মা আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

সত্যিই একটা ভালো কাজ করে এসেছে।

মা ভাবছে, বাচ্চাকে কি পুরস্কার দেবে। খরগোশ এখনো কোন পুরস্কার পায়নি। সকাল বেলা উঠলেই দেখবে মা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভাবছে, কি পুরস্কার তার ছেলেকে দেওয়া যায়।

লোভের শাস্তি

এক জেলে আর জেলেনী। তারা বড় গরীব। জেলে খালে বিলে মাছ ধরে, সে মাছ বিক্রী করে যা পায়, তাতেই তার দিন চলে। কোন দিন অন্য জেলেদের সঙ্গে নৌকা করে নদীতে যায়, সাগরেও যায়। তিনচারদিন পরে ফিরে আসে। মাছগুলি পথেই বিক্রী হয়ে যায়। তাতে বেশ দু' পয়সা হয়। কিন্তু তা মাসের মধ্যে দু'একদিন মাত্র। এই দু'এক দিনের আয়েই সংসার কিছু স্বচ্ছল হয়। জেলেনীর মুখে হাসি ফোটে। জেলেকে দু' একখানা শাড়ী বা দু' একখানা রূপোর গয়না, কিনে দিতে বলে।

জেলে যা পারে কিনে দেয়। কিন্তু জেলেনীর মন ভরে না। স্ত্রীর জন্য জেলের মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। তবুও সে ভূতের মতো খাটে। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, নৌকায় নৌকায় ফিরে, কিংবা জাল কাঁধে করে এখানে ওখানে মাছ ধরে।

তাতে আর কি হবে? যে-দুঃখ, সে-দুঃখ। যদি তার একখানা নিজের নৌকা থাকত, তা হলে একাই সে মাছ ধরত। বিক্রী করে বেশী পয়সাও পেত, ভাল করে খেতে পেত, ভালো করে থাকতে পেত।

কিন্তু নৌকা কিনতে অনেক টাকার দরকার। এতগুলি টাকা কোন দিনই একসঙ্গে সে পাবে না। এই নৌকাও হবে না।

মনের দুঃখে একদিন রাত থাকতে জাল কাঁধে করে জেলে বার হল। কারু সঙ্গে আর সে যাবে না। বেশী মাছ পায় ত ভালো। তা নইলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরবে। যে জীবনে কেবল কষ্ট সে জীবন রেখে লাভ কি ?

ভোর বেলা। রাস্তায় কেউ নেই। কেবল গাছে গাছে পাখীদের কিচির মিচির শব্দ। চলতে চলতে জেলে এসে দাঁড়াল নদীর ধারে। কোন দিকে প্রথম জাল ফেলবে, এই মনে ভাবছে। প্রথম ক্ষেপে জালে যদি কোন মাছ না পড়ে, তবে সারাদিন সে আর কিছুই পাবে না। জেলে চারদিকে তাকাচ্ছে আর ভাবছে।

এমন সময় একটা গাঙচিল কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে নদীর পূব-দক্ষিণ কোণে। জেলে বুঝল গাঙচিলটা মাছের খোঁজে আছে। গাঙচিলরা জানে নদীর কোথায় মাছ থাকে। জেলে সেদিকে এগিয়ে গেল। গাঙচিলটা উড়তে উড়তে হঠাৎ ছোঁ মেরে জলের ভিতর থেকে একটা মাছ ঠোঁটে করে আবার উপরে উঠে গেল। জেলেও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জাল ফেলল। তারপর জাল টেনে তুলে দেখল, জালে একটা বড় মাছ। এতবড় মাছ সে জীবনে ধরে নি। তাড়াতাড়ি জালটা সে ডাঙ্গায় তুলল। কিন্তু মাছটাকে যেই ধরবে অমনি সেটা বলে উঠল, ভাই আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমার উপকার করব। কাল তুমি আবার এখানে এসো।

জেলে মাছটাকে জলে ছেড়ে দিল। নিমেষের মধ্যে সে জলের ভিতর ঢুকে গেল।

জেলে তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে জেলেনীকে সব কথা বললে। জেলেনী শুনে বললে, আচ্ছা বোকা লোক ত। এত যে-সে মাছ নয়। এ নিশ্চয়ই মৎস্যরূপী দেবতা তুমি কিছু চাইলে না কেন?

জেলে বললে, মাছ আবার কথা বলে! কখনো দেখিনি, শুনিও নি। আমি একেবারে অবাক। কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আর সময়ও পেলাম না। তবে আমাকে আবার যেতে বলেছে।

জেলেনী শুনে মহাখুশী। সে জেলেকে বললে, দেখ আমাদের একটা শোবার ঘর নেই। তুমি মাছের কাছে একটা ঘর চেয়ে নিও।

জেলে জেলেনীর কথায় সায় দিল না। সে কি আবার হয় নাকি! এমনি এমনি একটা ঘর পাওয়া যাবে! মাটি ফুঁড়ে একটা ঘর উঠতে পারে? নিজের কোন চেষ্টা করতে হবে না। কোন পরিশ্রম করতে হবে না। আপনি আপনি একটা ঘর হয়ে যাবে!

জেলেনী বললে, তুমি চেয়েই দেখ না। যে মাছ কথা বলতে পারে, সে মাছ যাদু জানে। যাদুতে কি না হয়।

জেলে আর কি করে। পরদিন আবার সকালবেলা নদীর ধারে গেল। জেলেকে দেখতে পেয়েই মাছটা কাছে এসে বললে, কি ভাই, কি চাই।

জেলে বললে, জেলেনী একটা ঘর চায়।

মাছ বললে, তাই হবে। তুমি চলে যাও।

জেলে বাড়ী ফিরে দেখে অবাক কাণ্ড। একটি সুন্দর ঘর।

দোরে জেলেনী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। জেলেকে দেখে জেলেনী বললে, কেমন আমি বলিনি? এই দেখ কেমন সুন্দর ঘর। এস ভিতরে এস।

জেলে ভিতরে ঢুকে আরও অবাক হল। একখানা শোবার ঘর, একটা বৈঠকখানা আর একটা রান্না ঘর। পিছনে একটি ছোট্ট বাগান। বাগানে নানা রকম ফুলের গাছ। কয়েকটা মিষ্টি ফলের গাছ।

জেলেও খুশী হল। এমন বাড়ীতে বাস করতে পারবে জীবনেও সে ভাবে নি।

দিন যায়। মাস যায়। বছর ঘুরে গেল। জেলেনী আবার উসখুস করতে লাগল। এত ছোট বাড়ী আর ভাল লাগে না। শহরে গিয়ে সে দেখে এসেছে বড় বড় পাকা বাড়ী, বাড়ীর সঙ্গে বড় বাগান, বাড়ীর ভিতর বড় উঠান। এমন বাড়ী না হলে বাস করে কি সুখ! একদিন জেলেনী জেলেকে বলে ফেললে কথাটা।

জেলে বললে, এত বেশ ভাল বাড়ী। ছিলুম ভাঙা ঘরে। জল পড়ত। এখন ত বেশ আরামে আছি। আমি মাছের কাছে আর কিছু চাইতে পারব না।

জেলের কথা শুনে জেলেনী ত রেগে আগুন, বললে এমনি পেলে কোন জিনিস কে না নেয়? তোমার মত বোকা ত আর দেখিনি। পৃথিবীতে যারা বোকা তারাই দুঃখে মরে। তুমি যাও।

জেলে আর কি করে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নদীর দিকে। আবার দেখা পেল সেই মাছের।

জেলের কাছাকাছি এসে মাছটা বললে, কি ভাই, আবার কি চাই।

জেলের নিজের চাইবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সে বললে, জেলেনী চায় বড় একটা পাকা বাড়ী।

বেশ তাই হবে—এই বলে মাছ জলের ভিতর চলে গেল।

জেলে তাড়াতাড়ি ফিরে দেখে এক মস্ত বাড়ী। বাড়ীর মধ্যে অনেকগুলি ঘর। চমৎকার করে ঘরগুলি সাজানো। ঘর ভরতি চেয়ার, টেবিল, খাট, পালঙ্ক। অনেক চাকরবাকর, গোয়ালভরা গরু। মস্ত বড় বাগান। বাগানে অনেক ফুলের গাছ, ফলের গাছ। বাড়ীর পিছনে মস্ত বড় পুকুর। পুকুরে অনেক মাছ। চার পাড়ে চারটি বাঁকানো ঘাট। সবই ছবির মত সুন্দর।

জেলে খুশী হল। জীবনে আর কি চাই। বাকী জীবনটা বেশ আরামেই কাটাব।

জেলের কথা শুনে জেলেনী হেসে বললে। শুধু একটা বড় বাড়ী থেকে লাভ কি। জমিদার না হলে সুখ নেই। হাজার হাজার বিঘে জমি থাকবে। থাকবে প্রজা, লোকলস্কর, পাইক-বরকন্দাজ, নায়েবগোমস্তা। আদায়-ওয়াশিল হবে, ভারে ভারে ঘি আসবে, দুধ আসবে, আসবে মিষ্টান্ন।

জেলেনীর তাই সাধ। জেলে মনে মনে রাগ করে। কিন্তু জেলেনীর মুখের উপর কিছু বলতে পারে না।

যাই হোক, মাছের দয়ায় হল জমিদারী।

জমিদারী পেয়েও জেলেনী খুশী হল না।

এক রাত্তিরের কথা। জেলে ও জেলেনী শুয়ে আছে। জেলের ঘুম এসেছে। জেলেনী হঠাৎ জেগে ওঠে জেলেকে বলে, শোন। আমার একটা কথা মনে পড়েছে। জমিদার হয়েও দেখলুম। কি এমন সুখ! এবার এক রাজ্যের রাজা হতে হবে। আমাদের রাজত্ব চাই।

জেলে শুনে ত একেবারে অবাক। জেলেনী বলে কি? রাজা আর রাজত্ব। জেলে হেসে উঠল। না, জেলেনীর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তা নইলে এমন কথা বলে কখনও। জেলে ঘুমুবার চেষ্টা করল। কিন্তু জেলেনী ঘুমুতে দেবে কেন? সে বললে, কাল সকালে গিয়েই মাছের কাছে রাজ্য চেয়ে নেবে।

জেলে বললে, মাছ কি তা দিতে পারবে? রাজ্য নিয়ে কি করব? এই ত বেশ আছি। ছিলুম ভাঙা ঘরে, খেতে পেতুম না। পেয়ে গেলুম জমিদারি। আর কিছু চেয়ো না, জেলেনী।

জেলেনী শুনবে কেন, বললে তুমি একবার যাও। গিয়েই দেখ না। যে জমিদারী দিতে পারে, সে রাজ্যও দিতে পারে।

জেলে আর কি করে। ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগল নদীর দিকে। নদীর ধারে গিয়েই মাছের সঙ্গে দেখা।

মাছ জিজ্ঞাসা করলে, এবার কি চাই। জেলে বললে, আমি কিছু চাইনে, আমি কিছু চাইনে। জেলেনী একটা রাজ্য চায়।

মাছ বললে, বেশ তাই হবে। এই বলে সে জলের ভিতর চলে গেল।

জেলে বাড়ী এসে দেখে, এক মস্ত বড় প্রাসাদ।

প্রাসাদের চার দিকে ঘিরে রয়েছে অনেক সিপাহী শান্ত্রী। কি জমকালো তাদের পোষাক! কাঁধে বন্দুক, কোমরে তরোয়াল। প্রাসাদের ভিতর গিয়ে দেখল, এক মস্ত বড় সিংহাসন। সিংহাসনে বসে আছে জেলেনী। তার মাথায় সোনার মুকুট। গলায় হার, তাতে নানারকম দামী পাথর বসানো। তা থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। হাতে জড়োয়া গয়না। পরনে সোনার সূতার কাপড়। সিংহাসনের দু'দিকে ছয়জন করে সুন্দরী দাসী। তারা রাণীকে হাওয়া করছে, চারিদিকে মণিমাণিক্য সোনারূপোর ছড়াছড়ি।

জেলে জেলেনীকে বললে, এবার ত তুমি রাজ্য পেয়েছ। আর কিচ্ছু চেয়ো না। এবার সুখে থাক।

জেলেনী রাণীর দুই ভুরু কুঁচকে গেল। সে জবাব দিল, কার কপালে কি আছে, কে বলবে? রাজ্য পেয়েই যে আমি সন্তুষ্ট থাকব, তারই বা ঠিক কি?

জেলে এবার রেগে গেল বললে, তুমি আর কি চাও। জেলেনী এবার বললে, আমি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হতে চাই। আর চাই সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ যেন আমাদের কথা মেনে চলে। সূর্য যেন আমার ইচ্ছামত উঠে আর অস্ত যায়। চন্দ্রও তাই। আমরা যখন চাইব তখন জল হবে। না চাইলে হবে না। বায়ু আমাদের কথা মতো চলবে।

জেলে ত এ কথা শুনে রেগে আগুন। সে বললে সাম্রাজ্য যদি চাও, তুমি চাইবে। আমি চাইতে পারব না। তোমায় মাছের কাছে যেতে হবে।

জেলেনী রাণীও ক্ষেপে উঠল। রাণী যেমন হুকুম করে তেমনি করে সে জেলেকে বললে—তুমিই যাবে। তুমি এখন আমার অধীন। আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে। তা যদি না শোন তবে সৈন্যরা তোমায় জেলে আটকে রাখবে। তুমি এখখুনি মাছের কাছে যাও।

শুনে জেলের ত চক্ষু স্থির। অথচ কোন উপায় নেই। রাণীর হুকুম না মানলে হয়ত বিপদে পড়তে হবে।

তারপর দিন সকাল বেলা জেলে ধীরে ধীরে গেল। জেলেনীর কথা বলবে কিনা ভাবছে, এমন সময় মাছই ভেসে উঠল। কথাটা জেলে বলি বলি করেও বলতে পারছে না। মাছ এসে জিজ্ঞাসা করল, কি ভাই, জেলেনীর আর কি চাই। জেলে বললে, সে একটা সাম্রাজ্য চাচ্ছে। শুধু তাই নয়। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণকে পর্যন্ত তার কথা মতো চলতে হবে।

মাছ শুনে জেলেকে বললে, এবার আবার ভাঙা ঘরেই ফিরে যাও।

জেলে ফিরে দেখে, কোথায় রাজসিংহাসন, কোথায় সিপাহী শান্ত্রী, মণি, মাণিক্য রূপা আর সোনা। কোথাও কিচ্ছু নেই। সব যেন স্বপ্নের মতো উবে গিয়েছে। পড়ে রয়েছে তাদের আগেকার ভাঙা কুঁড়ে খানি।

আর কুঁড়ের মধ্যে ছেঁড়া কাপড় পরে মাথা নীচু করে বসে আছে জেলেনী।

[redacted] চুপ করে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

যাদুকরের কীর্তি

এক দেশের এক রাজা। রাজার মন্ত্রী আছে, সেনাপতি আছে, আর আছে শহরকোটাল। আরও অনেক কর্মচারী আছে। তাদের সীমাসংখ্যা নেই।

রাজার ধারণা তিনি একটি বুদ্ধির জাহাজ। এই বুদ্ধিকে আটকে রাখবার জন্য তাঁর মাথায় থাকে বিরাট পাগড়ী। রাজার কর্মচারীদেরও বুদ্ধি কম নয়। রাজা বুদ্ধির জাহাজ, তাই তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধির নৌকা, বুদ্ধির ডিঙি, কেউ বা বুদ্ধির শালতি। সবাই চালাক, সবাই চতুর। এদের পরামর্শেই রাজা রাজ্য চালান, বিচার করেন।

এতগুলি বুদ্ধিমান যেখানে থাকে, সেখানে প্রজাদের তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। কখন কার কি হয় বলা যায় না।

একবারের কথা। রাজধানীর কাছে আছে একটি বড় নদী। সে নদীতে বহু দূর থেকে নৌকা করে ব্যাপারীরা মাল নিয়ে আসে। ধান, চাল, ডাল, চিনি, সরষে, নানারকমের মসলা, আরও কত কি। আসে হাড়িকুরী, বাসনকোশন, টুকিটাকি হরেক রকম জিনিস। মাল বিক্রী করে ব্যবসায়ীরা আবার চলে যায়।

শীতকাল। মালের নৌকাগুলি বাঁধা আছে। এমন সময় উঠল ভীষণ ঝড়। ঝড়ে নৌকাগুলি সব ডুবে গেল। ব্যবসায়ীরা ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সব মাল ডুবে

গিয়েছে। একখানা নৌকাও নেই। এখন কি হবে? ব্যাপারীরা সবাই গিয়ে কেঁদে পড়ল রাজার কাছে, মহারাজ আমাদের বাঁচান। আমরা ত দেশে-বিদেশে ঘুরি। শীতকালে এমন ঝড়ে ত কখনো পড়িনি। এই ঝড় এমনি হয়নি। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

রাজা পাগড়ী নেড়ে বললেন, আচ্ছা, আমি দেখছি। তোমরা এখন যাও।

তারা চলে গেল। রাজা ডাকলেন মন্ত্রীকে, মন্ত্রী ডাকল সেনাপতিকে, সেনাপতি ডাকল কোটালকে। হঠাৎ কেন এমন ঝড় উঠল? এর কারণ বার করতে হবে এখনই।

রাজার হুকুম তামিল করতেই হবে। কিন্তু কেউ কিছু ঠিক করতে পারছে না। ঝড়ের আবার সময় অসময় কি? তা হ'ক। একটা কারণ খুঁজে বার করতেই হবে। তা' না হলে চাকরিই যাবে। তিন জন তিন দিকে গেল।

সন্ধ্যেবেলা সব রাজদরবারে ফিরে এল। মন্ত্রী আর সেনাপতির মুখে হাসি নেই। কোটাল কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছে।

রাজা বললেন, ঝড়ের কারণ তোমরা জানতে পেরেছ?

রাজার কথা শুনে মন্ত্রী চায় সেনাপতির দিকে, সেনাপতি চায় কোটালের দিকে। কোটাল রাজার কাছে এগিয়ে এসে বললে, মহারাজ। কুমোর বেটাদের দোষেই এই ঝড় উঠেছে। তারা চাকে আগুন দেয়। আগুন থেকে প্রচুর ধোঁয়া হয়। সেই ধুঁয়া ওঠে আকাশে। ধুঁয়া জমে মেঘ হয়। আর সেই মেঘ থেকে হয় ঝড় আর বৃষ্টি। অসময়ে ঝড়ের জন্য কুমোররাই দোষী।

কোটালের কথায় সবাই সায় দিল। রাজ্যের যত কুমোর ছিল, সবাইকে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে রাজদরবারে নিয়ে আসা হল। কেন? না তাদের বিচার হবে।

বিচারও হল। বিচারে কুমোররাই দোষী সাব্যস্ত হল।

রাজা বললেন, তোমরা সবাই ব্যাপারীদের ক্ষতিপূরণ করবে।

বিচার দেখে কুমোরের দল ত অবাক। কিন্তু কি করবে? রাজার হুকুম মানতে হবে। সবাই ঘরদোর জায়গা-জমি বিক্রী করে ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ করল। রাজার সুবিচারে খুশী হয়ে ব্যাপারীরা দেশে চলে গেল।

কিন্তু কুমোরের দল পড়ল মহাবিপদে। জমি গেল, জিরেত গেল, ঘর গেল বাড়ী গেল। কি করে দিন চলে!

কুমোরদের সর্দারের হল সব চাইতে বিপদ। এতগুলি লোক তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কি করা যায়—কি করা যায়। সর্দার দিনরাত ভাবতে লাগল। এদের কি করে বাঁচানো যায়!

এখন, সর্দারের একটা বড় গুণ ছিল। সে যাদু জানত। যে কোন জীবকে পাথর আর পাথরকে জীব বানাতে পারত। এমনি কত কত কলা-কৌশল। এ বিদ্যে দিয়ে মানুষকে তাক লাগানো চলত, কিন্তু তাতে পেট ভরত না। তাই সে নিজের কাজই করে যাচ্ছে মন দিয়ে চাক চালাচ্ছে। দিন বেশ চলে যায়। ওসব ভেল্‌কিবাজি একরকম সে ছেড়েই দিয়েছে।

কয়েকদিন ভেবে ভেবে সর্দার ঠিক করল, কি করবে। কেমন

করে কুমোরদের জায়গা-জমি ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কাউকে কিচ্ছু জানাল না। তার মনের কথা কেউ জানতে পারল না। একদিন রাত্রে সর্দার কোথায় চলে গেল। যাবার আগে সকলকে বলে গেল, তোমরা কিচ্ছু ভেবো না। আমি কয়েক দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসছি।

সর্দার চলে যাবার কয়েক দিন পরেই রাজধানীতে একটা সোরগোল উঠল, নীল বেড়াল! নীল বেড়াল! শহরের চৌরাস্তার মাঝখানে একটা নীল বেড়াল বসে আছে। গাড়ী-ঘোড়া সব বন্ধ, ভয়ে ভয়ে লোকজন সে-পথ দিয়ে হাঁটছে না। কারণ, নীল বেড়াল কেউ কখনো দেখেনি।

রাজার কাছে খবর গেল। রাজা খবর পাঠাল মন্ত্রীকে। মন্ত্রী খবর পাঠাল সেনাপতির কাছে, সেনাপতি খবর পাঠাল কোটালের কাছে। শহররক্ষার ভার কোটালের।

প্রথমেই এল কোটাল। বেড়ালটার কাছে এসে হাততালি দিয়ে সে বলল, এই যা, পালা। এখানে থাকা চলবে না।

বেড়ালটা ফ্যাঁচ করে উঠে জবাব দেয়, কেন?

বেড়াল কথা বলছে। কোটালের মনে মনে ভয় হল। কিন্তু শহরের কোটাল সে, তার ভয় পেলে চলবে কেন? কোনো মতে ভয় চেপে রেখে সে বললে, আমাদের রাজ্যে নীল বেড়াল নেই। নীল বেড়ালের থাকা এখানে চলবে না।

বেড়াল থাবা দিয়ে গোঁফটা একটু আঁচড়ে নিয়ে জবাব দিল,

নীল বেড়াল এ রাজ্যে আগে ছিল না। এখন ত আমি আছি। অসুবিধাটা কি ?

এমনি সময় সেনাপতি এসে গেল। বেড়ালের জবাব শুনে সে বললে, অসুবিধা আছে বৈ কি। যা কখনও ছিল না, এ রাজ্যে তা থাকবে না। এই হল এখানকার নিয়ম। তাছাড়া, নীল বেড়াল নিয়ে আমরা কি করব ?

এমন সময় দুধের ভাঁড় হাতে এসে দাঁড়াল মন্ত্রী। তার বাড়ীতেও গোরু আছে। কিন্তু রাজবাড়ীর গোরুর দুধের মত তার গোরুর দুধ এত ভালো নয়। তাই রাজবাড়ীর গয়লাকে নগদ এক টাকা দিয়েছে, সে দুধের জন্য। এ দুধ না খেলে তার বুদ্ধি খোলে না। রাজকাজে ভুল হয়ে যায়। তাই প্রত্যহ এ ব্যবস্থা। কেউ পাছে দুধে জল ঢেলে কম দুধ দেয়, এই ভয়ে নিজের হাতে দুধ নিয়ে যায়।

মন্ত্রীকে দেখে সেনাপতি বললে, তুমি বেড়ালের খবর ভালো জানো। তোমার বাড়ীতে দুধ আছে, বেড়ালও আছে। এখন বল ত এ নীল বেড়াল নিয়ে আমরা কি করি ?

মন্ত্রী মাথা চুলকে বললে, বড়ই ভাবনার বিষয়, সেনাপতি। নীল বেড়াল যে থাকতে পারে, এত আমার মনে হয় না।

কোটাল বললে, আমাদের রাজ্যে যে সব দলিল আছে, তাতে নীল বেড়ালের নামগন্ধও নেই।

সেনাপতি গম্ভীরভাবে বলে, তা হলে নীল বেড়ালও নেই।

ফ্যাঁচ। শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল।

বেড়াল বললে, নেই? এই বলে সে লাফ দিয়ে উঠে মন্ত্রীর দিকে গেল। ভয়ে মন্ত্রীর হাত থেকে ভাঁড়টা পড়ে গেল একটা গর্তে। বেড়ালটা চুক্ চুক্ করে সবটা দুধ খেয়ে ফেলল। তারপরে সেনাপতির দিকে চেয়ে বললে দেখ, আমি আছি কিনা। যে বেড়াল নেই, সে কি কখনো দুধ খায়।

এর উপর আর কোন কথা নেই। কিন্তু মন্ত্রীর মনে বড় দুঃখ। সমস্ত দুধটাই বেড়ালের পেটে গেল। দুধ খাওয়াও হল না। এখন দুধের দাম কে দেবে?

বেড়াল থাবা দিয়ে গোঁফ আঁচড়াতে লাগল। মন্ত্রী কোটালের দিকে চেয়ে বলল, তোমাকেই দুধের দাম দিতে হবে। তোমার দোষেই আমার দুধ গেল। কোটাল জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেনাপতি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, তা হলে এটা বেড়াল ঠিকই। হয়ত কেউ নীল রঙে একে চুবিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।

ভয়ের কারণ নেই? বেড়ালটা ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগল। আরও বড়। আরও বড়। ক্রমে শহরের সব চাইতে উঁচু বাড়ীর সমান হয়ে উঠল।

মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল ত একেবারে ভয়ে কাঠ। বেড়াল বললে, এবার তোমরা ওঠ আমার পিঠে।

বলে কি? প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। এর পিঠে উঠতে হবে! কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের।

বেড়াল বললে, আর দেরী কেন? উঠে পড়। নইলে—

কথাটা শেষ না করে ফ্যাঁচ করে সে তিনজনের দিকে এগিয়ে এল।

ভয়ে আঁৎকে উঠে তারা প্রথমে বেড়ালের লেজের উপর উঠল, তারপর উঠল তার পিঠে।

বেড়ালটা এবার একটা লাফ দিল। একলাফে একেবারে একটা বনের মধ্যে এসে পড়ল। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে তিন জনকেই শূন্যে তুলে দিল। তারপর সে তাদের দিকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। বড় বড় দাঁতগুলি সূর্যের আলোয় ঝলকে উঠল, বড় বড় গোঁফ বাতাসে দুলতে লাগল। আর উপর থেকে মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল একে একে টুপ্‌ টুপ্‌ করে পড়তে লাগল। আর সড়াৎ করে চলে গেল একেবারে বেড়ালের পেটে। ভাগ্যে বেড়াল তাদের চিবিয়ে খায় নি, তা হলে তারা মরেই যেত।

খাওয়া শেষ। কিন্তু এবার বেড়ালের বিপদ শুরু। কাছাকাছি একটা বড় গাছ ছিল। সে গাছ থেকে এক গাছা দড়ি নেমে এল বেড়ালটার মুখের কাছে। দড়িটার মুখের কাছে একটা ফাঁস। এ ফাঁসটা বেড়ালের গলায় গেল আটকে। বেড়াল ফাঁস ছাড়াবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করল। কিন্তু বৃথা!

এমন সময় গাছ থেকে নেমে এল এক যাদুকর। তার গায়ে কালো পোষাক, মাথায় কালো পাগড়ী, হাতে যাদুকরের কালো দণ্ড। বেড়ালের গায়ে সেটা ছোঁয়াতেই এত বড় বেড়ালটা একটা ছোট্ট মাটির বেড়াল হয়ে গেল। কিন্তু রঙ নীলই রয়ে গেল। পেটের ভিতর যে মানুষগুলি ছিল, তারাও কুঁকড়ে ছোট হয়ে

গেল। অবশ্য কেউ তা বুঝতে পারল না। কারণ, সকলের মাপই তখন সমান।

এদিকে রাজ্যে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। নীল বেড়াল নেই, আর, সেই সঙ্গে রাজ্যে মন্ত্রী নেই, সেনাপতি নেই, কোটাল নেই। রাজ্যচলে কি করে? রাজাকে কেই বা বুদ্ধি দেয়। রাজা পড়ল মহা ভাবনায়। কোথায় গেল এ তিনজন? এদের খবর কি? নীল বেড়ালটারই বা কি হল?

চারদিকে লোকের ছুটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। রাজার কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাজার চোখে ঘুম নেই, শুয়ে শান্তি নেই, খেয়ে স্বস্তি নেই। কোথায় গেল মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল?

চারদিকে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহরের আনাচে কানাচে খোঁজা চলছে। রাজধানীর বাইরেও লোক খুঁজতে চলে গিয়েছে।

এমন সময় দেখা গেল, একটা ফেরিওলা একটা কাঠের গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছে। চারটা চাকার শব্দ হচ্ছে ঘড়-ঘড়-ঘড়। আর সে হাঁকছে, নীলাম-ওয়ালা দু-দু' আনা, যা নেবে নাও দু' আনা। গাড়ীর উপর সাজানো আছে নানা রকমের খেলনা, বাঁশী, বাজনা, পুতুল। আর আছে একটা নীল মাটির বেড়াল।

একজন রাজকর্মচারী যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। ফেরিওলার ডালায় নীল বেড়ালটা দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সে শুনেছিল নীল বেড়ালের সঙ্গে মন্ত্রী, সেনাপতি ও কোটাল কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে। সে বেড়ালটা জ্যান্ত না মাটির,

তা সে জানত না। নীল বেড়াল ত নীল বেড়াল। সে মাটিরই হ'ক আর জ্যান্তই হ'ক।

রাজকর্মচারীটি নীল বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে বললে, এটার কত দাম ?

ফেরিওয়ালা জবাব দিল, দু'আনা। বড় সুন্দর দেখতে। আলমারীতে সাজিয়ে রাখা চলবে।

দু'আনা দিয়ে কিনে নীল বেড়ালটা সে রাজার কাছে নিয়ে এল।

রাজা দেখে ত আগুন। এটা ত একটা মাটির বেড়াল। এ দিয়ে কি হবে।

রাজার ধমকে কর্মচারীর হাত থেকে বেড়ালটা পড়ে ভেঙ্গে গেল। আর তার পেট থেকে বার হল ছোট ছোট তিনটি মানুষ।

রাজা ত অবাক। সিংহাসন থেকে ভালো করে দেখা যায় না। সে কাছে এগিয়ে এল। কাছে এগিয়ে এসে রাজা চেঁচিয়ে উঠল, আরে এ যে মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল। এদের এমন দশা হল কি করে ? কি করে এমন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল ?

রাজকর্মচারী রাজাকে খুশী করবার জন্য উত্তর দিল, মহারাজ এরা হয়ত রোদে শুকিয়ে এমন হয়ে গিয়েছে।

থাম তুমি—রাজা রেগে বললে, তুমি এখ্‌খুনি সেই ফেরিওলাকে ধরে নিয়ে এস।

রাজকর্মচারী হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

কে আছ ? রাজা হাঁকল।

একজন রাজকর্মচারী এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

রাজা বললে, দেখো ত এই ছোট ছোট জীবগুলো। এদের আমার সামনের ওই টেবিলের উপর এখন রেখে দাও। দেখো, সাবধান। যেন পড়ে না যায়।

রাজা ভাবছে, নিশ্চয়ই ফেরিওলা একটা দুষ্ট যাদুকর। এরই এই কাণ্ড। এদিকে রাজকর্মচারীটি ফেরিওলাকে খুঁজে পেয়েছে। সে তখনও হাঁকছে, দু' দু' আনা, যা নেবে নাও দু'আনা।

রাজকর্মচারীটি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে তাকে ধরে বললে, তুমি করেছ কি? মাটির বেড়ালের পেটে মানুষ। তা আবার যে-সে মানুষ নয়। তারা হল রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল। চল রাজদরবারে। তোমার আজ রক্ষে নেই।

ফেরিওলা বললে, চল। দেখেই আসি।

ফেরিওলা রাজদরবারে হাজির। রাজা সিংহাসনে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

ফেরিওলাকে দেখেই রাজা একেবারেই জ্বলে উঠল, বললে, আমি জানি, আমার রাজ্যের ক্ষতি করবার জন্যই আমার মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটালকে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে। আর এদের মাপ কমিয়ে মাত্র তিন ইঞ্চিতে দাঁড় করিয়েছ। এদের যদি তুমি আগেকার চেহারা করে দিতে না পার, তাহলে আমি তোমাকে শূলে দেব।

ফেরিওলা উত্তর দিল, মহারাজ, আমার একটা কথা আছে।

রাজা বললে, কি কথা বল।

ফেরিওলা বললে, যদি মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল তাদের আগের চেহারা পায়, তাহলে আমায় কি দেবেন।

তুমি যা চাও তাই দেব। রাজা আশ্বাস দিল।

ফেরিওলা বললে, তাহলে মহারাজ, কুমোরদের সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দিন। তারা ত কোন দোষ করেনি। বিনা দোষে তাদের শাস্তি হয়েছে।

রাজা প্রশ্ন করল, বিনা দোষে? তারা চাকে আগুন দেয় নি? তা থেকে ধুঁয়া উঠে নি? এ ধুঁয়া থেকে মেঘ হয় নি? এ মেঘের জন্য ঝড় হয় নি?

ফেরিওলা বললে, না মহারাজ। তা হয় নি। পৃথিবীতে ঝড় হবেই, হচ্ছেও। তার জন্য কুমোররা দায়ী নয়। আপনি পণ্ডিতদের ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা তাই কি পারে? তাহলে যে লোকে বলবে রাজার বুদ্ধি নেই। মাথার পাগড়ীতে সে একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর বললে, বেশ তাই হবে।

যাদুকর এবার তার যাদুদণ্ড মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটালের মাথায় ছুঁইয়ে দিল। এবার সবাই আপন চেহারা ফিরে পেল।

কিন্তু সেনাপতি একটু খুঁত খুঁত করতে লাগল, সে যেন একটু বেশী মোটা হয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, সে নীল বেড়ালটার কি হল? কর্মচারীটি বললে, সেই মাটির নীল বেড়াল? সেটাত ওই ভেঙে পড়ে আছে।

মন্ত্রী বললে, না জ্যান্ত নীল বেড়াল।

রাজা এবার ধমক দিয়ে উঠল, জ্যান্ত নীল বেড়াল? কোনকালেই ছিল না। ছিল তোমাদের মগজে।

সেনাপতি হেসে বললে, কেমন আমি বলি নি নীল বেড়াল ব'লে কোন জীব নেই।

মন্ত্রী বললে, তবে আমার দুধ কে খেল? দুধের দাম কে দেবে?

রাজা এবার কটমট করে চাইল কোটালের দিকে। যত নষ্টের গোড়া এই কোটাল। রাজা বললে—দুধের দাম দেবে এই কোটাল। যত গণ্ডগোল পাকিয়েছে ঐ লোকটা। নীল বেড়াল ছিল না, সে দুধও খায় নি। তবুও জরিমানা দিতে হবে কোটালকে।

মন্ত্রী আর সেনাপতি বললে, মহারাজ, এবার আমরা বাড়ী যাই। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। আর খানিকক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যাব।

রাজা বলল, না, না, এখানে দাঁড়িয়ে থাক তোমরা। আমি একদিন একটু বিশ্রাম ক'রেনি। পরে যাবে।

রাজা অন্দর-মহলে চলে গেল। মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। রাজার আদেশ তারা অমান্য করবে কি করে?

এদিকে সর্দার ফিরে এসে কুমোরদের জানাল সব কথা। সম্পত্তি সব ফিরে পাবে শুনে তারা সবাই লাফিয়ে উঠল।

মলয়কুমার ও রাজকুমারী

এক দেশের এক রাজা! রাজার দুই রাণী। বড় রাণীকে রাজা দেখতে পারেন না। তাই তিনি থাকেন রাজবাড়ী থেকে দূরে, এক বনে। তাঁর একটিমাত্র ছেলে। তার নাম মলয়কুমার। মলয়কুমারও মায়ের সঙ্গে বনে থাকে। মা ও ছেলের দুঃখকষ্টে দিন চলে। রাজা কোনদিনও তাদের খোঁজ করেন না।

ছোট রাণীর দুই ছেলে। তপনকুমার আর বিজনকুমার। ছোট রাণীর দুই ছেলে যেন রাজার দুই চোখের মণি। তারা সব সময়ই রাজার কাছে কাছে থাকে, আবার ভালো ভালো পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। রাজভোগে তাদের দেহের কান্তি দিন দিন বাড়ছে।

রাজার তিন ছেলেই ক্রমে বড় হয়ে উঠল।

ছিল শিশু, হল কিশোর। তারপর সবাই একদিন যৌবনে পা দিল।

এমন সময় রাজা পড়লেন অসুখে। হাকিম এল, বদ্দি এল, এল কত ওষুধবিষুধ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অসুখ আর সারে না। রাণী ভয় পেয়ে গেল, মন্ত্রী ভয় পেল, সেনাপতি ভয় পেল, রাজ্যের প্রজাদের চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া। সবারই মুখ মলিন।

রাজা বুঝি আর বাঁচবেন না।

রাজার যখন এই অবস্থা, তখন রাজবাড়ীতে এল এক সাধু। পরনে তার গেরুয়া কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর হাতে রুদ্রাক্ষের বালা, মাথায় লম্বা জটা, মুখে দাড়ি আর, কপালে বড় একটা সিঁদুরের ফোঁটা। পায়ে খড়ম। খড়মের খটাস খটাস শব্দ করতে করতে সাধু রাজবাড়ীর সিংদরজা পেরিয়ে একেবারে হাজির হলেন রাজার ঘরে। রাজাকে দেখেই সাধু বললেন, হাকিম-বদ্যিরা কেউ রাজাকে বাঁচাতে পারবে না। রাজার আয়ু মাত্র আর ছ'মাস। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে যদি কেউ……

এই পর্যন্ত সাধু থেমে গেলেন।

রাজার ঘরে যারা ছিল তারা সবাই সাধুর মুখের দিকে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে রইল। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, ঠাকুর থামলেন কেন? বলুন।

সাধু হেসে বললেন, বলে আর কি হবে? তবু বলি শুনুন। এখান থেকে বহুদূরে দক্ষিণ দিকে এক রাজ্য আছে। রাজ্যের নাম রাজনগর। রাজনগর রাজ্যের রাজা নেই। আছে এক রাজকুমারী। এক রাক্ষস রাজকুমারীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। রাজকুমারীর সঙ্গে রাজ্যের লোকও সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ আর সেখানে জেগে নেই। এই রাজকুমারীর ঘরের পুবদিকে বাগানের ভিতর একটি ছোট্ট ঝরনা আছে। এই ঝরনার কাছে শুয়ে থাকে এক অজগর। দিনরাত সে ঝরনা পাহারা দেয়। এই ঝরনার জল যদি রাজার কোন প্রিয়জন নিয়ে এসে খাওয়াতে পারে, তা হলেই সেই রাজা বেঁচে উঠবেন।

এই কথা বলেই সাধু চলে গেলেন।

ছোট রাণীর দুই ছেলে সেখানে বসেছিল। তপনকুমার বললে, আমিই রাজনগর থেকে জল নিয়ে আসব। যদি এক মাসের মধ্যে না ফিরি, তাহলে বুঝতে হবে আমি বিপদে পড়েছি। তখন আর কেউ যাবে।

তপনকুমার মনে মনে ভাবল, এই জল কেউ আনতে পারবে না। রাজাও আর বাঁচবেন না। সুতরাং ছ'মাস পরে সেই ত রাজা হবে। আর যদি জল নিয়ে আসতে পারা যায়, তাহলে রাজা খুশী হবেন। রাজত্ব পেতে আর কোন অসুবিধা হবে না।

এই ভেবে একদিন এক ঘোড়া নিয়ে তপনকুমার রওনা হল। রাজনগরের পথ কোন দিকে সে জানে না। সে কেবল চলছে দক্ষিণ দিকে। তপনকুমার দিনে চলে, রাতে বিশ্রাম করে। এইভাবে সে দেখল কত দেশ, ডিঙ্গিয়ে গেল কত পাহাড়, পার হল কত নদী, পার হয়ে চলে গেল কত বন। কিন্তু কোথায় রাজনগর? কেউ রাজনগরের নামও জানে না। কেউ রাজনগরের পথ বলতে পারে না। তপনকুমার চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত এল এক পাহাড়ের গুহার কাছে। গুহার মুখে বসে আছে থুরথুরে এক বুড়ো। তার চুলদাড়ি সব শাদা। এত লম্বা দাড়ি সে আর কখনো দেখে নি। গাল থেকে দাড়ি ঝুলে পড়েছে মাটিতে। গায়ে শাদা আলখাল্লা। হাতে তার একটা লাঠি।

তপনকুমারকে সে দেখে বললে, আমায় কিছু খেতে দেবে? সারাদিনের পরিশ্রমে তপনকুমারের একে ত মেজাজ ঠিক নেই।

তারপর দুদিন ভালো করে খাওয়াও হয় নি। সঙ্গেও দেবার মত বিশেষ কিচ্ছু নেই। তাই সে একেবারে জ্বলে উঠে খাপ থেকে তরোয়াল খুলে বুড়োকে তেড়ে মারতে গেল।

বুড়ো একটু হাসল, বললে, তুমি কোথায় যাবে?

রাজকুমার উত্তর দিল, রাজনগর। বলতে পার, রাজনগর কোথায়?

বুড়ো বললে, যাও, এই গুহার ভিতর দিয়ে যাও। গেলেই পথ পাবে।

তপনকুমার তাড়াতাড়ি গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তপনকুমার সেখানে আটকে রইল।

এক মাস গেল। তপনকুমার ফিরে আসে না। এবার বার হল বিজনকুমার। বিজনকুমারের আনন্দের আর সীমা নেই। দাদা নিশ্চয়ই আর বেঁচে নেই। এবার সেই রাজা হবে। তবু একবার লোক দেখানো চেষ্টা করা ত দরকার।

ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে বিজনকুমারও এসে গেল সেই গুহার কাছে। সে থুরথুরে বুড়ো ঠিক গুহার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। বিজনকুমারকে দেখে, সে তার কাছে আবার খাবার চাইল।

বিজনকুমার বললে, তোমাকে খাওয়াবার জন্য আমি এত দূর আসি নি। খেতে না পাও ত মরে যাও।

বিজনকুমার আর দাঁড়াল না। এগিয়ে চলল।

চার দিকেও আর কোন পথ নেই। একটি মাত্র পথ সেই

গুহা। বিজনকুমার ফিরে এসে রাজনগরের পথ ধরবার জন্য সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে আগেকার মতই গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

দু'ভাই আটকে রইল সে গুহার ভিতর।

আরও একমাস কেটে গেল। বিজনকুমারের দেখা নেই। রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন। মন্ত্রী আর সেনাপতি উদ্বিগ্ন হল। রাজ্যের লোক ভেবে আকুল। রাজা নইলে রাজ্য চলে না। আর চার মাস মাত্র রাজার আয়ু আছে। এদিকে দুই কুমারের কি হল, কে জানে।

এদিকে মলয়কুমার শুনতে পেল রাজার অসুখের খবর। একদিন সে মাকে বললে, আমি যাব রাজনগর। রাজনগরের রাজবাড়ী থেকে ঝরনার জল নিয়ে আসব।

বড়রাণী ছেলেকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি যাও। কাজ শেষ করে ফিরে এস। পথে কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। সবার উপকার করবার চেষ্টা করবে।

মাকে প্রণাম করে ঘোড়ায় চড়ে মলয়কুমার রওনা হল। চলতে চলতে এসে গেল সেই গুহার কাছে। সেই বুড়ো ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। মলয়কুমারকে দেখে বুড়ো তার কাছে খাবার চাইল।

মলয়কুমারের সঙ্গে যে খাবার ছিল, তা সে সব দিয়ে দিল বুড়োকে। বহুদিন পরে ভালো খাবার পেয়ে ত বুড়ো মহাখুশী। খাবার খেয়ে মলয়কুমারকে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় যাবে?

মলয়কুমার সব কথা সরলভাবে তাকে জানাল।

বুড়ো এবার বললে, রাজনগর মাত্র আর একদিনের পথ। তুমি পাহাড়ের ডানদিকে যে পথ আছে, সে পথ দিয়ে চলে যাও। পথের শেষে দেখবে একটা রাজবাড়ী। সে রাজবাড়ীতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। এক রাক্ষসের মায়ায় শুধু রাজবাড়ীর লোকই নয় রাজ্যের সবাই ঘুমিয়ে আছে। একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত জেগে নেই। বরাবর বাড়ীর ভিতর ঢুকে যাবে। সোজা যাবে অন্দরমহলে। অন্দরমহলের সব চাইতে সুন্দর এক ঘরে দেখবে, এক পরমসুন্দরী রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। ঘরের দুয়ার বন্ধ। কারো এ দুয়ার খুলবার সাধ্য নেই। এই নাও আমার হাতের লাঠি। এই লাঠিটা দোরে ছোঁয়ালেই তা খুলে যাবে। দোর খুলেই দেখবে, এক রাক্ষস বসে আছে রাজকন্যার কাছে। তুমি ভয় পেও না। তোমার হাতের লাঠি দেখলেই, সে ভয়ে আর তোমাকে কিছু বলবে না। তুমি রাজকুমারীর ঘরের পাশে যে দোর দেখতে পাবে, সে দোর দিয়ে বার হয়ে এসে বাগানে পড়বে। এই বাগানের পূবদিকে দেখবে এক ঝরনা। ঝরণার কাছে এক অজগর সাপ। তোমাকে দেখলেই অজগর ফুঁসে উঠবে। তোমাকে গিলে ফেলবার চেষ্টা করবে। এই লাঠি তার ফণায় ছোঁয়ালেই সে একেবারে পাথর হয়ে যাবে। তারপর তুমি ঝরনার জল নেবে। জল নিয়ে এর খানিকটা জল ছিটিয়ে দেবে রাজকুমারীর দেহে। তখনই রাজকুমারী জেগে উঠবে আর জেগে উঠবে রাজ্যের লোক-জন। বাকী জলটুকু নিয়ে তুমি এই পথেই আবার ফিরে আসবে।

বুড়োর লাঠি নিয়ে মলয়কুমার তাড়াতাড়ি পাহাড়ের পথে চলে গেল।

সত্যিই একদিনের পথের শেষে দেখা গেল এক রাজবাড়ী। মলয়কুমার তার ঘোড়া বাইরে বেঁধে রেখে লাঠি হাতে ঢুকে গেল রাজবাড়ী। চলল অন্দরমহলে। সামনেই এক সুন্দর ঘর। লাঠি ছোঁয়াতেই ঘরের দোর খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট রাক্ষস লাফিয়ে উঠল। মলয়কুমার লাঠিটা তুলে ধরল। লাঠি দেখেই রাক্ষসটা একেবারে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। এক খাটে রাজকুমারী ঘুমুচ্ছে। আর দেরী করবার উপায় নেই! পাশের দোর দিয়ে সে বাগানে এসে পড়ল। তাকে দেখেই অজগরটা হাঁ ক'রে তাকে গিলবার জন্য ছুটে এল। বুড়োর কথামতো সে লাঠিটা অজগরের মাথায় ছুঁইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অজগর একেবারে পাথর হয়ে গেল। মলয়কুমার তাড়াতাড়ি ঝরনার জল নিয়ে এসে খানিকটা জল রাজকুমারীর গায়ে ছিটিয়ে দিল। রাজকুমারী জেগে উঠল। সে জলের ছিটা পড়ল রাক্ষসটার গায়। রাক্ষসটা ছট্‌ফট্ করে মরে গেল। রাজবাড়ীর এবার সব লোক জেগে উঠল। জেগে উঠল রাজ্যের লোক। এমন কি সেখানকার জন্তু-জানোয়ার পোকা-মাকড়ও সব জেগে উঠল।

মলয়কুমারকে দেখে রাজকুমারী বললে, তুমি আমাদের রাজ্য বাঁচালে, রাজ্যের লোক বাঁচালে। রাক্ষসটা আমার বাবা-মাকে মেরে ফেলে আমাকে মায়ামন্ত্রে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ছিল। আমি ঘুমিয়ে যেতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি জাগতেই সব আবার

জেগে উঠেছে। এ রাজ্য এখন আমার, আমাকে বিয়ে করলে এ রাজ্য তোমারই হবে।

মলয়কুমার রাজার অসুখের কথা রাজকুমারীকে জানিয়ে বললে, আমাকে এখুনি বেরোতে হবে এই জল নিয়ে। এই জল নাপেলে রাজা মারা যাবেন। আমি এক বছর পর তোমার সঙ্গে আবার দেখা করব।

রাজকুমারী বললে, বেশ, তাই হবে। এক বছর পরে তুমি আসবে ঘোড়ায় চেপে। সে ঘোড়া হবে ধবধবে শাদা। তার কান দুটো হবে কালো। তা হলেই আমি তোমাকে চিনতে পারব।

মলয়কুমার চলে গেল। পথে আবার সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা।

মলয়কুমার বুড়োকে বললে, তোমার দয়ায় আমি রাজনগরের ঝর্নার জল পেয়েছি। আশা করি, বাবা এ জল খেলেই বেঁচে উঠবেন। কিন্তু আমার ভায়েদের কি হল? তারা ত এই পথেই এসেছিল। তাদের কোন বিপদ হয়নি ত?

বুড়ো বললে, তোমার মন ভাল। তোমার দয়া আছে। তুমি কাউকে কড়া কথা বল না। তাই তুমি দুঃসাহসের ফল লাভ করেছ। তোমার ভায়েরা লোক ভালো নয়। তাই আমি তাদের আটকে রেখেছি এই গুহার মধ্যে। ছাড়বার ইচ্ছা ছিল না, তবে তোমার জন্যই ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, এরা তোমার অনিষ্ট করতে পারে।

এই বলে সতর্ক ক'রে দিয়ে সে তপনকুমার আর বিজনকুমারকে মুক্ত করে দিল।

মলয়কুমার ত দুই ভাইকে দেখে মহাখুশী। সে আনন্দে তাদের সব কথা বলে ফেলল। কথা শেষ করে সে দুই ভাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হল রাজবাড়ীর দিকে।

এদিকে তপনকুমার আর বিমলকুমার হিংসায় জ্বলে মরছে। মলয়কুমার যদি জল নিয়ে যায় আর রাজা ভাল হয়ে যান, তাহলে ত রাজত্ব পাবে মলয়কুমার। তা হবে না। এ জল আমরাই নিয়ে যাব।

ঘোড়ায় চড়ে তারা তিনজন পথ চলছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আর এগোনো যাবে না। তাই তারা বনের মধ্যে একটা গাছের নীচে ঘোড়া বেঁধে রেখে বিশ্রামের স্থান খুঁজে বেড়াতে লাগল। খানিক দূরেই দেখা গেল, ভাঙ্গা এক শিব-মন্দির। এ শিবমন্দিরেই তারা শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত। মলয়কুমার ঘুমিয়ে আছে। তপনকুমার আর বিজনকুমার ধীরে ধীরে উঠে বসল। মলয়কুমারের মাথার কাছেই জলের পাত্র। তারা সেই জল নিজেদের পাত্রে ঢেলে নিল আর মলয়কুমারের পাত্রে ঢেলে দিল শিবমন্দিরের কুয়ার খানিকটা বিস্বাদ জল। মলয়কুমার কিচ্ছুই টের পেল না।

তার পরদিন ঘোড়া ছুটিয়ে তারা তিন ভাই শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুল নিজেদের রাজ্যে। মলয়কুমার তক্ষুণি রাজার

কাছে গিয়ে সেই জল খাইয়ে দিল। এতে কিন্তু রাজার রোগ সারল না। তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হল।

সুযোগ বুঝে আর দুই ভাই চুরি করা জল রাজাকে খাইয়ে দিল। রাজা ভাল হয়ে উঠলেন। দুষ্টু দুই ভাই রাজাকে বুঝিয়ে দিল যে, মলয়কুমার কখনো জল আনতে যায় নি। রাজাকে মেরে ফেলার জন্য নিশ্চয়ই জলে সে বিষ দিয়েছিল।

রাজাও তাই বুঝলেন। তিনি মলয়কুমারকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মনের দুঃখে মলয়কুমার কোথায় যে চলে গেল, কেউ তা জানল না।

আরও কয়েক মাস গেল। তপনকুমার রাজকুমারীর কথা মলয়কুমারের কাছে শুনেছে। সে এবার চলল রাজনগর। সে মনে ভাবল, এতদিন পরে মলয়কুমারের কথা কি তার মনে আছে? সব ঘটনা বললেই রাজকুমারী তার কথা বিশ্বাস করবে। তারপর হবে বিয়ে। সে তখন হবে দুই রাজ্যের রাজা। এই ভেবে সে মনের আনন্দে ঘোড়া ছুটিয়ে এল রাজনগরে। কিন্তু ঘোড়া দেখেই রাজকুমারী বুঝল, এ মলয়কুমার নয়। সে তাকে বন্দী করে রাখল। তারপর গেল বিজনকুমার। তারও লোভ কম নয়। রাজকুমারী তাকেও কারাগারে আটকে রাখল।

এবার রাজকুমারী বুঝল, ভায়েদের ফন্দীতে মলয়কুমারের নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি একজন দূত পাঠিয়ে দিল রাজার রাজ্যে। তার সঙ্গে গেল অনেক লোকজন ভেট নিয়ে। দূতের সঙ্গে এক চিঠিও রাজকুমারী পাঠিয়ে দিল।

সে চিঠিতে মলয়কুমার কি করে ঝরনার জল নিয়ে গিয়েছিল, তাও লিখে দিল।

চিঠি পড়ে ত রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এই গুণবান ছেলেকে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন। আর যে দু'জন তাকে ঠকিয়েছে, তাদেরই কিনা তিনি রাজ্য দিতে যাচ্ছেন?

রাজার হুকুমে দিকে দিকে লোক ছুটল মলয়কুমারের খোঁজে। কিন্তু কোথায় মলয়কুমার? তার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

এদিকে বছর শেষ হয়ে আসছে। রাজনগরের রাজকুমারী দিন গুণছে।

কিন্তু মলয়কুমারের দেখা নেই। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে বনে। ঘুরতে ঘুরতে আবার সে এসে পড়ল সেই বুড়োর কাছে। বুড়ো ত তাকে দেখে মহাখুশী। সে তাকে মনে করিয়ে দিল রাজকুমারীর কথা।

মলয়কুমার বললে, বাবা আমার তাড়িয়ে দিয়েছেন। ভাইরা আমায় ঠকিয়েছে। মা আছেন বড় দুঃখে। আমার বেঁচে থেকে লাভ কি?

বুড়ো বললে, ভাই দুঃখ করো না। পৃথিবীতে সুখও আছে, দুঃখও আছে। যে ভালো, তার চিরদিন দুঃখ থাকে না। আমি তোমার জন্য একটা ঘোড়া রেখেছি। ঘোড়াটা শাদা রংএর। তার কান দুটো কালো। আর মাত্র দু'দিন সময়। তুমি এক্ষুণি এই ঘোড়ায় চড়ে রাজনগর চলে যাও।

মলয়কুমারের গায়ে ছেঁড়া পোশাক। চুল উস্কোখুস্কো। স্নান নেই, আহার নেই। শরীর খুব দুর্বল। তবুও সে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; এল রাজনগরের রাজবাড়ীতে। রাজকুমারকে দেখে সেখানে আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল।

রাজকুমারী বললে, রাজা সব কথা জানতে পেরে তোমাকে ক্ষমা করেছেন। এবার চল আমরা দু'জন রাজার কাছে যাই। তোমার ভাইয়েরা আমাকে ঠকাতে এসেছিল। আমি তাদের বন্দী করে রেখেছি।

মলয়কুমার বললে, তুমি তাদের ছেড়ে দাও। চল সবাই মিলে রাজার কাছে যাই।

তিন ভাই আর রাজকুমারী এল রাজার কাছে। রাজা মলয়কুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর দুই ছেলেকে শূলে দেবার হুকুম দিলেন। মলয়কুমার বললে, বাবা, এরা ভুল করেছিল। আপনি এদের ক্ষমা করুন। আমি রাজ্য চাই না, রাজনগরের রাজ্য পেলেই আমি খুশী হব।

মলয়কুমারের অনুরোধে রাজা তপনকুমার আর বিজনকুমারকে শাস্তি দিলেন না।

মহাসমারোহে রাজকুমারীর সঙ্গে মলয়কুমারের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর সে তার দুঃখিনী মা আর রাজকুমারীকে নিয়ে রাজনগর ফিরে গেল। মায়ের মুখে হাসি ফুটল, রাজকুমারীর আনন্দের সীমা নেই। মলয়কুমার রাজনগরের রাজা হয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগল।

পশুর কৃতজ্ঞতা

এক দেশে এক গরীব লোক বাস করে। তার থাকবার মধ্যে আছে ছোট একটি ভাঙা কুঁড়ে আর মাটির থালা-বাটি। দিন আর চলে না। কোন দিন খেতে পায়, কোন দিন পায় না। গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে কাজ জোগাড় করে। কাজ না করলে পয়সা দেবে কে? আর, সবদিন কাজও জোটে না। সেদিন সে আর পয়সা পায় না। ফলে সারাদিন উপবাস।

এমন করে আর কদিন চলে। একদিন সে কুঁড়েটাকে বেচে দিল। তাতে সামান্য ক'টা টাকা পেল। তার পরদিন ঐ টাকা ক'টা নিয়ে সে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। দেখা যাক, ব্যবসা-বাণিজ্য করে কিছু আয় করতে পারা যায় কিনা।

লোকটি ঘুরতে লাগল। এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ। কোথাও কিছু সুবিধা হচ্ছে না। ব্যবসাবাণিজ্যও হচ্ছে না। ঐ সামান্য টাকায় কিই বা হবে। খেতেই ত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সে মহা চিন্তায় পড়ল। কি করা যায়?

একদিন সে বেড়াতে বেড়াতে এক গাঁয়ে এসে হাজির। এসেই দেখে কতকগুলি ছেলে একটা ইঁদুরের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাণের ভয়ে ইঁদুরটা চিঁচিঁ [illegible]ছে। লোকটি ছেলেদের কাছে গিয়ে বললে, ভাই, তোমরা একে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের পয়সা দিচ্ছি। খাবার কিনে খেও।

ছেলেরা মহাখুশী। পয়সা নিয়ে ইঁদুরকে ছেড়ে দিয়ে তারা নাচতে নাচতে চলে গেল।

ইঁদুর বললে, ভাই, বিপদে পড়লে আমাকে মনে করো। আমি হয়ত তোমার কোন উপকার করতে পারি।

ইঁদুরের কথা শুনে লোকটি বলল, বেশ। তুমি এখন লুকিয়ে পড়। সময়মত নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মনে করব।

ইঁদুর খুশী হয়ে চলে গেল তার গর্তে।

লোকটি আবার চলতে আরম্ভ করল। খানিক দূর গিয়েই দেখে এক জেলের জালে এক মস্ত বড় কোলা ব্যাঙ ধরা পড়েছে। জেলেটা সেটাকে আছাড় মারতে যাচ্ছে, এমনি সময় লোকটি বললে, ভাই, এত তোমার কোন অনিষ্ট করেনি। তবে কেন একে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছ? একে ছেড়ে দাও। আমি বরঞ্চ তোমায় কিছু পয়সা দিচ্ছি।

একটা ব্যাঙের বদলে পয়সা পেয়ে জেলে চলে গেল। ব্যাঙ বললে, ভাই, বিপদে পড়লে আমায় মনে করো। আমি হয়ত তোমার কোন কাজে লাগতে পারি।

এই বলে ব্যাঙ পুকুরের জলে লাফিয়ে পড়ল।

আবার খানিক দূর যেতেই লোকটি দেখে একটা লোক লাঠি হাতে একটা বেড়ালকে তাড়া করেছে। বেড়ালটা প্রাণের ভয়ে ছুটে যাচ্ছে। লোকটি তাড়াতাড়ি তার হাতের লাঠি ধরে বললে, কেন ভাই, বেড়ালটাকে মারবে। আমি তোমায় পয়সা দিচ্ছি একে ছেড়ে দাও।

পয়সা পেয়ে লোকটা আর এগোল না, চলে গেল। বেড়ালটা লোকটির কাছে এসে বললে, ভাই, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। সময়মত আমায় মনে করো। আমি হয়ত তোমার কাজে লাগব।

এই বলে বেড়াল ধীরে ধীরে চলে গেল।

ইঁদুর, ব্যাঙ আর বেড়ালের উপকার করতে গিয়ে লোকটির যে ক'টি পয়সা ছিল, তা সব খরচ হয়ে গেল। খাবার কিনবার জন্য আর একটি পয়সাও নেই।

অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। লোকটিরও হল তাই। খানিক দূর গিয়ে সে দেখে রাজার বাড়ী আলোয় আলোময়। চারদিকে লোকজন। গানবাজনা হচ্ছে।

লোকটি মনে ভাবছে রাজারা কত সুখী। তাদের কত টাকা। আর গরীবদের পয়সা নেই। খেটে খেটে তাদের জীবন যায়। একজনের কাছে এত টাকাই বা থাকবে কেন? লোকটি মনে মনে ভাবে আর এগোয়। রাজবাড়ীর সামনেই একটা বড় গাছ। গাছটার নীচে সে বসে পড়ল।

লোকটি একভাবেই বসে আছে। রাত ক্রমে গভীর হল। রাজবাড়ীর গণ্ডগোল থেমে গেল। একেবারে সব নিঝুম। ধীরে ধীরে লোকটি উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে সে একেবারে রাজবাড়ীর পিছনে এসে গেল। তারপর দেয়াল বেয়ে সে উপরে উঠে পড়ল। এসে পড়ল একটা দালানে। দালানে আলো জ্বলছে। সে লুকিয়ে একটা মোটা থামের আড়ালে গিয়ে দেখে, পাশে একটা বড় ঘর। সে ঘরের মধ্যে টাকা-পয়সা-মণিমাণিক্য থরে

ঘরে সাজানো। লোকটির চোখ চক চক করে উঠল। দু'হাতে যত পারে, সে তত টাকাপয়সা তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বেরিয়ে আসা আর হল না।' চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। রাজা তার বিচার করে হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে কারাগারে আটক করে রাখলেন।

লোকটি কারাগারে শুয়ে আছে। কতদিন থাকতে হবে কে জানে? রাত হয়েছে। ঘুম আর আসছে না। হঠাৎ তার ইঁদুরের কথা মনে পড়ে গেল। বিপদের দিনে ইঁদুর তাকে সাহায্য করবে বলেছিল। কি সাহায্য করতে পারে একটা সামান্য ইঁদুর? ভাবতে ভাবতে লোকটি এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কুট কুট শব্দ শুনে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখে ছোট একটা ইঁদুর তার দড়ি কাটছে। আস্তে আস্তে পায়ের দড়ি কেটে গেল। কেটে গেল হাতের দড়ি। লোকটি এবার উঠে দাঁড়াল।

ইঁদুর বললে, এবার পালাও। পাশের দরজা খুলে রেখে পাহারাদার বাইরে গিয়েছে। সেখান দিয়ে তুমি চলে যাও।

এই বলে ইঁদুরটা গর্তের ভিতর ঢুকে গেল।

লোকটি পাশের ঘরে এসে দেখে, সত্যই ত দরজা খোলা। সে তাড়াতাড়ি কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে রাস্তায়। তারপর একেবারে দিল দৌড়। ছুট, ছুট, ছুট। ছুটতে ছুটতে সে একেবারে এসে পড়ল গাঁয়ের শেষ সীমায় নদীর ধারে।

নদীর ধারে বসে সে ভাবতে লাগল, এখন সে কি করবে। কি করেই বা দিন চলবে। এখুনি তাকে এ গাঁ

ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে রাজার কোটাল এসে থাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে। আবার সেই কারাগার। আবার সেই যমযন্ত্রণা। না, বেঁচে আর লাভ কি? গরীবের মরণই ভালো। নদীতে ঝাঁপ দিয়েই সে ডুবে মরবে। এই ভেবে সে নদীতে ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় একটা বড় ঢেউ এসে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। আর ঢেউএর সঙ্গে উঠে এল একটা শাদা বড় পাথর। অনেকটা হাঁসের ডিমের মত দেখতে।

লোকটির আর নদীতে ঝাঁপ দেওয়া হল না। খুব দামী জিনিস ভেবে সে পাথরটা হাতে তুলে নিল। হাতে তুলে নিতেই এক অবাক কাণ্ড! সে চমকে উঠে দেখে, একটা বিরাট দৈত্য তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, এ পাথর যখন যার, আমি তখন তার। তার কথামত কাজ করব, হুকুম পালন করব।

লোকটি প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এখন দৈত্যটার কথায় সাহস পেয়ে সে বললে, আমাকে একটা বড় বাড়ী করে দাও। বাড়ীর সঙ্গে থাকবে একটা বড় পুকুর আর বাগান।

দেখতে দেখতে নদীর ধারে একটা বড় বাড়ী হয়ে গেল। তার সঙ্গে হল বাগান আর পুকুর। লোকটি সেই বাড়ীতে আরামে বাস করতে লাগল। খাওয়া-পরার আর দুঃখ রইল না।

আনন্দে তার দিন কাটছে।

একদিন সে-পথ দিয়ে যাচ্ছে একদল বণিক। তাদের সঙ্গে অনেক গাধা, ঘোড়া আর বলদ। এদের পিঠে নানারকম জিনিস। বণিকরা যাচ্ছে শহরে এগুলি বিক্রী করতে। এত বড় বাড়ী দেখে

তারা অবাক। গত বছরও ত তারা এপথে দিয়ে গিয়েছে। এমন বাড়ী ত এখানে দেখেনি। এ কার বাড়ী? খোঁজ নিতে হবে। নিশ্চয়ই কোন বড়লোক। হয়ত কিছু জিনিস বিক্রী করে দু'পয়সা লাভ করা যাবে।

এই ভেবে তারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটি একটি ঘরে বসে ছিল। একথা সেকথার পর বণিকরা জিজ্ঞাসা করল, কি করে এত বড় বাড়ী তৈরী হল? আমরা ত আগে এখানে কোন বাড়ী দেখিনি?

লোকটি বড় সরল। সে বললে, একটি পাথরের গুণেই আমার এই বাড়ী, বাগান আর পুকুর।

দলের যে সর্দার সে বললে, পাথরটা আমাদের দিয়ে দাও। আমাদের সঙ্গে যা জিনিস আছে, তুমি তা নিয়ে নাও।

লোকটি ভাবল, পাথরটায় আমার আর কি দরকার। আমি ত বেশ সুখেই আছি। এদের এই জিনিসগুলি পেলে, বিক্রী করে অনেক টাকাপয়সা পাব।

এই ভেবে বোকা লোকটি পাথরটা দিয়ে দিল।

বণিকরা পাথর নিয়ে চলে গেল।

পর মুহূর্তেই দেখা গেল, বাড়ী নেই, বাগান নেই, পুকুর নেই! লোকটি আবার বসে আছে সেই নদীর ধারে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। আবার যে-দুঃখ সে-দুঃখ! পাথরটা হাতছাড়া করে সে কিই না বোকামি করেছে।

এবার তার মনে পড়ল ইঁদুরের কথা, বেড়ালের কথা আর

বেঙের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর, বেড়াল আর বেঙ তার কাছে হাজির। তারা শুনল সব কথা।

এখন কি করা যায়! কি করে পাথরটা আবার ফিরে পাওয়া যায়! তিনজনে পরামর্শ করতে বসল।

এক রাত্তিরের ভিতর বণিকরা বেশী দূর যেতে পারেনি। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। আর সর্দারের কাছেই আছে সে পাথরটা।

তারা তিনজনে রওনা হল। গিয়ে দেখে যা ভেবেছে ঠিক তাই। নদীর ওপারে বণিকরা তাঁবু ফেলেছে। খোঁজ নিয়ে আরও দেখা গেল, সর্দারের তাঁবুটা ঠিক নদীর ধারে। ইঁদুর, বেড়াল আর বেঙ তাঁবুটার কাছাকাছি এগিয়ে এল। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, সর্দার ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে। আর তার মাথার কাছে একটা সূতার সঙ্গে পাথরটা ঝুলছে।

বেড়াল ইঁদুরকে বললে, তুমি ভেতরে গিয়ে সূতাটা কেটে দাও। তাহলেই ওটা মাটিতে পড়ে যাবে। আর আমি থাবায় করে ওটা সরিয়ে দেব। বেঙভায়া সেটা মুখে করে নিয়ে যাবে।

পরামর্শমত সব কাজই হল। ইঁদুর কেটে দিল সূতা। বেড়াল থাবা দিয়ে সরিয়ে দিল পাথরটা। আর বেঙ সেটা মুখে করে বেরিয়ে এল। বেড়াল চলে গেল লোকটিকে খবর দিতে।

কিন্তু বেঙ ত আর সহজভাবে হাঁটতে পারে না। সে চলে থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে। ঝাঁকুনি লেগে পাথরটা

মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। আর তা পড়বি ত পড় একেবারে নদীর জলে।

বেঙের আর দুঃখের অন্ত রইল না। সে ছিল বেঙদের রাজা। সেই গাঁয়ের পুকুরে, বিলে, ঝিলে, খালে যত বেঙ ছিল, সবার কাছে সংবাদ গেল। রাজার ডাকে সবাই এসে হাজির। কি করতে হবে? না, একটা পাথর তুলতে হবে নদীর ভিতর থেকে।

হুকুম পাওয়া মাত্র সব বেঙ এক সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল নদীর জলে। নদীর মধ্যে খোঁজাখুজি শুরু হয়ে গেল। একটা মোটা বেঙ প্রথমেই দেখতে পেল শাদা পাথরটাকে। পাথরটায় তখনো সূতাবাঁধা আছে। এবার সবাই মিলে সূতা ধরে টানতে টানতে পাথরটাকে উপরে তুলে ফেলল।

এদিকে খবর পেয়ে লোকটি এসে গিয়েছে। পাথর দেখে ত সে মহাখুশী।

আবার তার বাড়ী হল, বাগান হল, পুকুর হল। লোকটি বন্ধুদের এবার আর ছাড়ল না। ইঁদুরের জন্য বড় একটা ঘর তৈরী হয়েছে, সেখানে সে-সুখে আছে। বেড়ালের জন্যও বাড়ী হল, দুধের ব্যবস্থা হল। আর বেঙের দল বাস করতে শুরু করল বন্ধুর পুকুরে। তারা খায়-দায়, গান গায় আর লাফালাফি করে খেলা করে।

লোকটির আর কোন দুঃখ রইল।

দুষ্টু ছেলের বিপদ

যখনকার গল্প বলছি, তখন তোমরা কেউ জন্মাও নি, আমিও জন্মাইনি। এগাঁয়ে এখন যারা আছে, তারাও কেউ জন্মায় নি। অনেক—অনেক দিন আগেকার কথা। হয়ত একশ' বছর আগেকার কথা—হয়ত আরো বেশী দিনের কথা। ঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে ঘটনাটা ঘটে ছিল এই গাঁয়েই। এ ঘটনার কথা তোমরা জানো না। আমার মতো যারা বুড়ো, তারা কিন্তু সবাই জানে।

এ গাঁয়ের পূব দিকে,—এখন যেখানে শিবের মন্দির আর তার সামনে বড় একটা পুকুর, সেখানে ছিল একটা বাড়ী। পাকা বাড়ী নয়। কাঁচা বাড়ী—খড়ের চাল আর মাটির দেয়ালের কাঁচাবাড়ী। সে বাড়ীতে থাকত এক চাষী আর তার গিন্নী। তাদের দু'টি ছেলে, অমল আর বিমল। অমলের বয়স বারো আর বিমলের দশ, দু'জনেই বড় দুষ্টু। মায়ের কথাও শোনে না, বাবার কথাও শোনে না। পাঠশালে যায় মাত্র। লেখাপড়ায় মন নেই। বই-শেলেট কোথায় থাকে, তার ঠিক নেই। সারাদিন কেবল বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। পাখীর ছানা খোঁজে, শেয়ালের গর্তের মুখে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে মজা দেখে, খরগোশের পিছু পিছু ছোটে। আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল, কুল চুরি করে খায়, ছড়ায় আবার বাড়ী নিয়েও আসে। মাঝে

মাঝে পাড়ার লোকেদের সখের বাগানে ঢুকে ফুল ছেঁড়ে, চাষীদের ক্ষেতের ফসলও চুরি করে কিংবা নষ্ট করে।

কেউ কেউ চাষীগিন্নীর কাছে নালিশ করে। আবার কেউ কেউ মারধোর করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। চাষীগিন্নীও ছেলেদের কিছু বলে না, শাসন করে না। চাষী ত বাড়ীতেই থাকে না। তার সারাদিন কাজ আর কাজ। মাঠে কাজ, খামারে কাজ, বাগানে কাজ, পুকুরে কাজ, একাই সে সব কাজ করে। ছেলেরা বাপের দিকে একবার চেয়েও দেখে না। সামান্য একটু সাহায্যও করে না।

আরও একটি ছেলে ছিল সে বাড়ীতে। তার কথা বলতেই ভুলে গিয়েছি। তার নাম কমল। সে চাষীর বোনের ছেলে। গরীব বোন খেতে পরতে পায় না। তাই দাদার কাছে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কমল অমল-বিমলের চেয়ে বয়সে ছোট। কিন্তু সে লেখাপড়া করে, আবার বাড়ীর কাজও করে। মাঝে মাঝে মামাকেও সাহায্য করে। সে বাজারে যায়, কাঠ কুড়িয়ে আনে, জল তোলে, মামার জন্য ভাত নিয়ে ক্ষেতে যায়। সারা দিন তার খাটুনি।

মামী কিন্তু কমলকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। নিজের ছেলেদের সে ভাল খাবার দেয়, কাপড় দেয়। আর কমলের ভাগ্যে জোটে পোড়া ভাত, পচা ডাল আর ছেঁড়া কাপড়।

এইভাবে দিন যায়। কমল মাঝে মাঝে কাঁদে। মায়ের জন্য প্রাণ কেমন করে। মায়ের জন্য মনটা উতলা হয়।

তখন শীতকাল। শীত খুব জেঁকে এসেছে। কনকনে ঠাণ্ডা। বাইরে বেরোবার উপায় নেই। আজ কয়দিন চাষী বাড়ীতে নেই। কি কাজের জন্য শহরে গিয়েছে। চাষীগিন্নীও সুযোগ বুঝে নিজের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে।

কমল একাই বাড়ীতে আছে। দিনের বেলা একরকম তার কেটেই যায়। কিন্তু রাত্রিবেলায় তার বড় ভয় করে। একা বাড়ীতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। সে যে খুব ভীরু ছেলে, তা নয়। তবুও ত ছেলেমানুষ! হঠাৎ কোন শব্দ শুনলে সে চমকে ওঠে, বুকটা কাঁপে। ভূতের কথা মনে হলে রামনাম জপ করে আর মায়ের শেখানো মন্ত্র পড়ে—

ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি,
রামনাম বুকে আছে, ভূতে করবে কি?

তার মা আর একটা মন্ত্রও শিখিয়ে দিয়েছে, চোর তাড়াবার মন্ত্র। কমল শোবার আগে সে মন্ত্র পড়ে—

কপ্‌পোল কপ্‌পোল
যদ্দূর যায় কপ্‌পোলের বায়,
চোর চোট্টা না বাড়ায় পায়।
বাঁধলাম ঘর, বাঁধলাম বাড়ী,
কোন চোরা করবে চুরি!

যে দিনের কথা, সেদিন রাত্রিবেলা কমল ঘরের মধ্যে বসে আছে। দোর-জানালা সব বন্ধ। বইপত্র সে গুটিয়ে রেখেছে।

পড়তে আর ইচ্ছা করছে না। একা বাড়ীতে কেবল মায়ের কথাই মনে হচ্ছে। সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। বাইরে কোথাও কোন সড়া শব্দ নেই।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হল। কমল চমকে উঠল। যে দিক থেকে শব্দটা এল, সে দিকে তার নজর পড়ল। কমল একেবারে শিউরে উঠল ; দেখে, ঘরের চালের বাতার ওপর বসে আছে ছোট্ট একটি মানুষ—ছোট ছোট পা, ছোট ছোট হাত, ছোট একটা মাথা গালে লম্বা সাদা দাড়ি। মাথায় আবার একটা পাগড়ী। সে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল নীচে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডান হাতে তার বড় একটা লাঠি আর বাঁ হাতে একটা ছোট ঝোলা। মানুষটা লম্বায় বারো ইঞ্চির বেশী নয়। কমল একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ভয়ে নয়, বিস্ময়ে। এমন মানুষ ত সে আর কখনো দেখেনি। এমন মানুষের কথা কখনো শোনেও নি, কোন গল্পের বইয়েও পড়েনি। মানুষটাকে দেখলে হাসিও পায়। বিশেষ করে অতটুকু মানুষের অত বড় পাগড়ী আর দাড়ি। অন্য সময় হলে হয়ত তার হাসিই পেত, কিন্তু এই রাত্রে কেউ কোথাও নেই, বাইরে কোন সাড়াশব্দ নেই, কনকনে শীত, চারদিক অন্ধকার—এ অবস্থায় সে খানিকটা ভয়ে ভয়েই সেই অদ্ভুত লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? লোকটা উত্তর দিল, আমাকে চিনবে না, ভাই। আগে ত কখনো দেখ নি। তুমি কেন? এ গাঁয়ের কেউ কখনো দেখেনি। শুধু এ গাঁয়ের কেন, ভিন্ গাঁয়ের কোন লোকও আমায় কখনো দেখেনি।

কমল আরও অবাক হল, প্রশ্ন করল, সে কি? তুমি তবে থাক কোথায়? তোমার বয়সই বা কত?

লোকটা উত্তর দিল, আমার বয়স যে কত, তা ভাই, ঠিক করে বলা শক্ত। তবে কেউ আমাকে দেখতে পারে না। কারণ, আমি বড় গরীব। এই দেখ না এই শীতে গায়ে জামা নেই। দু'দিন কিছু খাইনি। যারা ভালো লোক, তাদের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াই।

কমলের মনটা গলে গেল। সে নিজে গরীব। সে দেখেছে, অনেকদিন তার মা কিছু খেতে পায় নি। কিন্তু শাকপাতা সিদ্ধ করে তাকে খাইয়েছে। তাদের গাঁয়ের বাড়ীর পাশে যারা আছে, তারাও তাদের মতোই গরীব। দিন আনে, দিন খায়। যেদিন কিছু পায়না, সেদিন উপোস করে থাকে। তাই না খেয়ে থাকার কষ্ট সে জানে।

তাই সে সেই ছোট্ট মানুষটাকে বললে, তুমি কিছু খাবে? রান্নাঘরে জল দেওয়া পোড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। এছাড়া বাড়ীতে আর যা কিছু খাবার আছে, তা সবই তালাবন্ধ।

লোকটি রাজী হল। কমল রান্নাঘর থেকে নিজের ভাতই দুই ভাগ করে দুই থালায় করে নিয়ে এল। তরকারি কিছুই নেই, আছে শুধু কলমী শাকের ঝোল। তা ছাড়া আছে কিছু নুন, লংকা আর কাচা পেঁয়াজ। আর নিয়ে এল দু' গেলাস জল।

খাওয়া দাওয়ার পর কমল তাড়াতাড়ি আলনা থেকে তার

একটা জামা নিয়ে এল, বললে, তোমাকে এই জামাটা দিলুম। যা শীত, তুমি জমে যাবে।

লোকটি তক্ষুনি জামাটা গায়ে দিল। কিন্তু বারো ইঞ্চি মানুষের ঐ জামা গায়ে হবে কেন? একে ত বড়, গায়ে দিলে দেখতে হল কতকটা আলখাল্লার মত। তাই জামাটা পরতে, তাকে দেখতে হল আরও অদ্ভুত। ওই অদ্ভুত চেহারা দেখে কমল কোন মতে হাসি চেপে গেল।

এবার লোকটি কমলকে বললে, তুমি আমায় খেতে দিয়েছ, পরতে দিয়েছ, তুমি খুব ভালো ছেলে। এবার দেখ আমার খেল। এই বলে লোকটা ঝোলা থেকে বার করল দুটো ছোট্ট থালা, দুটো ছোট্ট গেলাস। ছোট ছোট মেয়েরা খেলাঘরে এ সব থালা-গেলাস নিয়ে পুতুল খেলে। বোধ হয়, সেখান থেকেই এগুলি সে নিয়ে এসেছে। তারপর যা ঘটল, তা দেখে কমল তো একেবারে অবাক। থালাগেলাসগুলো ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে সেগুলো সাধারণ থালাগেলাসের মতো হয়ে গেল। লোকটা আবার ঝোলার ভিতর হাত দিল, বার করে নিয়ে এল সন্দেশ, রসগোল্লা, খাজা, গজা, নিমকি আরও নানা রকমের খাবার। যার নাম কমল জানে না। একে একে তা সাজানো হল থালায় থালায়।

তারপর দু'জনে বসে গেল খেতে। মহা আনন্দে কমল খাবার খাচ্ছে, আর লোকটার সঙ্গে গল্প করছে। লোকটা খুব ভালো তাতে সন্দেহ নেই। তবে এ নিশ্চয়ই মানুষ

নয়। পরীর দেশের কোন জাব। নইলে এমন কাণ্ড কখনো হয়!

ঠিক এমন সময় বাইরের দুয়ারে ঘা পড়ল। কমল তাড়াতাড়ি বললে, ঐ যা মামীমা এসে পড়েছে। এখন কি হবে?

লোকটা নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কমলকে বললে, চুপ করে থাকতে। তারপর নিমেষের মধ্যে সে অদ্ভুত লোকটা যে কোথায় মিলিয়ে গেল, কমল ঠিক বুঝতে পারল না। ঘরের মধ্যে আর কিচ্ছু নেই, খাবার নেই, গেলাস নেই, থালা নেই।

কমল বাইরে গিয়ে দুয়োর খুলে দিল। মামীমা আর মামাতো ভাই দুটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তখনো প্রদীপ জ্বলছে দেখে মামীমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তেল সস্তা? তাই পিদিম জ্বলছে? অকম্মার ধাড়ি! কোন জ্ঞানগম্যি নেই। যা বেরো ঘর থেকে।

কমল ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে গেল।

তার পরের দিন। দিনমানে কমলের খাটুনির আর অন্ত নেই। সন্ধ্যে হয়ে এল। তাই কি খাটুনির শেষ হল? না। মামী এবার বললে জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতে। 'না' বলবার উপায় নেই। তা হলে বকুনি খেতে হবে, হয়ত ধরে মারবেও।

কমল একাই ঠাণ্ডার মধ্যে বেরিয়ে গেল। আর দু' ভাই অমল আর বিমল গায়ে বেশ করে গরম আলোয়ান জড়িয়ে ঘরে বসে রইল। ক্রমে রাত্রি হয়ে এল।

আবার সেই কাণ্ড। ছোট্ট লোকটা চালের বাতা থেকে

লাফিয়ে পড়ল। দু' ভাই ত ভয়েই অস্থির। চীৎকার করে আর কি? তাই বুঝতে পেরে লোকটা বললে, দেখ ত আমি কত ছোট। তোমাদের ভয়টা কি? আমি কি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারি?

লোকটার কথা শুনে এবার তারা আশ্বস্ত হল। বড় ভাই বললে, তোমায় দেখতে ত বেশ। সারা গায়ে সাদা চুল। শীতকালে আর জামার দরকার হয়না। কি বল হে, বাঁদর ভায়া?

লোকটি বলল, ভাই, আমি সারা দিন কিচ্ছু খাইনি। কিছু খেতে দেবে?

ছোট ভাই বললে, কেন কলাগাছে কলা নেই? তাই খেয়ে আজ কাটাও। তারপর কাল এসো, দেখা যাবে। তোমার জন্যে শিকল কিনে রাখব।

বড় ভাই বললে, কিহে বাঁদর ভায়া, তোমার মাথায় আবার পাগড়ি পরিয়ে দিল কে? এই অমল কেড়ে নেত ওটা।

অমল যেই এগিয়ে গেল, আর দেখা গেল না লোকটাকে। একেবারে অদৃশ্য!

এই ভাই দুটি ছিল বড় বোকা। সামান্য মাত্র বুদ্ধি থাকলে তারা বুঝতে পারত, এ লোকটা স্বাভাবিক জীব নয়। ভিতরে কিছু একটা রহস্য আছে। আর তা ছাড়া এমন একটা ছোট্ট মানুষ ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্রই নয়। কেউ যদি খিদেয় কাতর হয়ে খাবার চায়, তাকে খেতে দিতে হয়। আর যদি খেতে দেবার ক্ষমতা না থাকে, তা হলে তাকে মিষ্টিকথায় বিদেয় করা ভালো।

তবে ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। তার পরের দিন রাত্রিবেলা দুই ভাই রান্নাঘরে বসে আছে। শীতকাল। উনুনের আঁচে শরীর গরম হচ্ছে। বেশ আরামও লাগছে। উনুনের ওপর একটা কড়াই। তাতে জল ফুটছে টগবগ করে। বড় ভাই চায়, সে নিজেই আগুন পোহানোর আরামটা ভোগ করবে। ছোট ভাই কিন্তু তাতে রাজী নয়। লেগে গেল দু'জনে ঠেলাঠেলি। এতে ধাক্কা লেগে কড়াইটা গেল উলটে। গরম জলে দু' ভায়ের পা গেল পুড়ে। দু'জনেই একেবারে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল, চীৎকার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে একজন পড়ে গেল মাটিতে। তাতে তার হাত গেল ভেঙ্গে। আর একজনের নাকটা লেগে গেল দোরের কপাটে। নাকটা তার থেঁতলে গেল।

হৈ চৈ চেঁচামেচিতে বাড়ীতে শোরগোল পড়ে গেল। মা ছুটে এল, পাড়ার লোক ছুটে এল। কমল কোথায় গিয়েছিল সেও ছুটে এল।

দু' ভাই তখন মাটিতে পড়ে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। রাত্রি ত কোন মতে কেটে গেল। তার পর দিন আবার বিপদের উপর বিপদ! একজনকে কুকুরে কামড়ে দিল আর একজনের গায়ে বোলতা হুল ফুটিয়ে দিল।

দু' ভাই যা করে, তাতেই তাদের বিপদ ঘটে। কিন্তু কমল বেশ আছে। খায় দায়, কাজ করে, গান করে আর আনন্দে ঘুরে বেড়ায়।

এদিকে শহর থেকে চাষী ফিরে এসেছে। দু'ভাইএর

ব্যাপার দেখে সে খুব বিরক্ত। মাও খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ছেলে দুটো একেবারে অকেজো। এদের বিপদ লেগেই আছে। আর কদ্দিন এ ভাবে চলে! কমল ত বেশ আছে। সব কাজই করে যাচ্ছে! অথচ একটি আঁচড়ও তার গায়ে লাগে না। সংসারে যারা অলস, বসে বসে থাকে, তাদের পদে পদেই বিপদ।

আর একদিনের কথা। অমল, বিমল আর কমল তিনজন চলেছে একটা দূরের মাঠের দিকে। সেখানে ক্ষেতে কাজ করতে হবে। চাষী একা পেরে উঠছে না। তাই ওদের সবাইকে যেতে বলে গিয়েছে।

তারা তিনজনই চলেছে। খানিক দূরে গিয়েই একটা বড় খাল। খালে জল কম। কাদায় ভরতি। খাল পার হবার জন্য দু'টো বাঁশ একসঙ্গে পেতে রাখা হয়েছে। সাবধানে যেতে হয়, কারণ, কাদায় পড়বার সম্ভাবনা। কমল বাঁশের উপর দিয়ে বেশ চলে গেল। অমল পার হতে গিয়ে পড়ে গেল কাদাভরতি খালের জলে। নরম তুলতুলে কাদা অমলের ভার সইতে পারবে কেন? তার শরীর ধীরে ধীরে কাদার মধ্যে বসে যাচ্ছে। বিমল চীৎকার করে এগিয়ে এল। দাদার একটা হাত ধরে তারা টেনে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারবে কেন? এদিকে কমলও এগিয়ে এসেছে। দু'জনেই এবার লোকজন ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

আশ্চর্য কাণ্ড! এর মধ্যে সেই ছোট্ট পাগড়ীপরা দাড়িওলা লোকটি এখন এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে। কেউ তাকে দেখতে,

পায়নি। বিমল, কমল আর সেই লোকটি এই তিন জনে মিলে অমলকে টেনে তুলল। তার সারা শরীর কাদায় মাখামাখি, মুখে কাদা, গালে কাদা। চেহারা দেখলে হাসি পায়।

এবার সেই ছোট্ট লোকটি বললে, অমল, বিমল এবার থেকে তোমরা সাবধান হও। বিপদে তোমাদের শিক্ষা হ'ক। আমি ছোট ছোট ছেলেদের রাজা। তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, গালমন্দ করেছ। তোমরা তোমাদের ছোট ভাই কমলের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার কর না। তোমরা জেনে রাখ, এই কমল তোমাদের বাড়ীতে আছে বলেই তোমরা বেশী বিপদে পড় না।

এই বলে ছোট ছেলেদের রাজা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পর থেকে অমল-বিমল খুব ভালো হয়ে গেল। তারা কমলের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। হেসে খেলে বেড়ায়। ঝগড়াঝাঁটি নেই, মারামারি নেই। একেবারে গলাগলি ভাব। চাষীগিন্নী দেখে ত অবাক। সেও যেন ক্রমে ক্রমে বদলে যাচ্ছে। কমলকে সে নিজের ছেলেদের মতই ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। চাষী আরও বিস্মিত। হল কি? চাষীগিন্নীর চেঁচামেচি, ছেলেদের পাড়া-বেড়ানো সব কোথায় গেল! বাড়ীর আবহাওয়াই পালটে গিয়েছে! চাষী খুব খুশী। সংসারে আর কোন দুঃখ রইল না। মিলে মিশে সবাই কাজ করে, একে অন্যকে সাহায্য করে।

চাষীর বাড়ী দিন দিন ধনে ধান্যে ভরে উঠতে লাগল।

খেয়ালের শাস্তি

রাজার একমাত্র মেয়ে। তার খেয়ালের অন্ত নেই। যখন যা চায় তাই পায়। যা আছে তা চায় না। মেয়েকে খুশী রাখতে গিয়ে রাজা হিমসিম।

আর চাকরবাকরের ত কথাই নেই, রাজকুমারী কখন কি চাইবে, কখন কি আবদার ধরবে, এইজন্য চাকরবাকর সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। কারো মনে শান্তি নেই। রাজকুমারী সবাইকে একেবারে পাগল করে তুলেছে। কোন উপায় নেই। চাকরি রাখতে হলে, রাজকুমারীর বায়না মেটানো চাই।

রাজকুমারীর বয়স মাত্র ছ'বছর। লোকে ভাবে, এই বয়সেই এমন! রাজকুমারী বড় হলে রাজ্যের কর্মচারীরা না জানি আর কি বিপদে পড়ে।

বিপদের কথা বই কি। কারণ, সেই রাজ্যে ছিল এক অদ্ভুত ব্যাপার। রাজ্যের লোক কেউ না কেউ কোন একটা জীব পোষে। কেউ পোষে পাখী, কেউ পোষে কোন একটা পশু।

রাজবাড়ীতে ত একটা মস্ত চিড়িয়াখানাই আছে। সেখানে সব রকম জন্তু-জানোয়ার আছে, অনেক রকম পাখী আছে।

সাধারণ লোকের বাড়ীতে ত আর চিড়িয়াখানা থাকতে পারে না। না থাকুক। তবুও রাজারই দেখাদেখি প্রত্যেককেই একটা না একটা জীব পুষতে হয়।

জীবজন্তু পোবার বয়স রাজকুমারীরও হয়েছে। রাজা একদিন মেয়েকে বললেন, মা তুমি কি পুষবে বল। যা চাও, তাই দেব। হাতী, বাঘ না সিংহ?' কোনটা তুমি চাও।

রানী বললেন, কি নেবে? কুকুর, বেড়াল না ভেড়া?

যারা চাইবামাত্র সব পায়, তাদের চাওয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। কোন জিনিসেই খুশী হয় না।

রাজকুমারী বললে, কি হবে, কুকুর, বেড়াল, সিংহ আর বাঘ দিয়ে। সে সব ত বাড়ীতেই আছে। আমি চাই এমন একটি মাছি, তার রং হবে সোনার মত, আর সব সময় শিস দেবে।

রাজারানী ত শুনে একেবারে অবাক। কোথায় পাওয়া যাবে এমন মাছি? রাজা বললেন, মা তুমি অন্য কিছু চাও। এমন মাছি ত পাওয়া যাবে না।

রাজকুমারী কি আর সে কথা শোনে? তার জেদ, সোনার মাছি এখুনি আনা চাই।

রাজা আর কি করেন। মেয়ের বায়না মেটাতে হবে। রাজ্যের চারদিকে খবর গেল, সোনার মাছি চাই। যে এই মাছি এনে দিতে পারবে, তাকে অনেক টাকা দেওয়া হবে। মাছিটা শুধুই সোনার হলে হবে না। সে যেন আবার শিস দিতে পারে।

লোকজন ছুটল সোনালী মাছির খোঁজে। যারা পশুপাখীর ব্যবসা করে, তারাও খুঁজে বেড়াতে লাগল সোনালী মাছি। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। বহুদিন চেষ্টা করেও কিন্তু সোনার মাছি পাওয়া গেল না।

একজন লোক ছিল খুব চালাক। সে এক কাজ করল। একটা বড় মাছি ধরে, সেটাকে সোনার জলে রাঙিয়ে নিয়ে হাজির হল রাজ-দরবারে।

রাজা মাছি দেখে ত মহাখুশী। তখুনি বাড়ীর ভিতর মাছিটাকে একটা সোনার খাঁচায় পুরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

রাজকুমারী মহা আনন্দে একেবারে নেচে উঠল। হাততালি দিয়ে বললে, বাঃ, বেশ মাছি! আমি এটাই পুষব।

মাছিধরা লোকটি অনেক টাকা নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু দু'দিন পরেই রাজকুমারীর মাছি পোষার সখ মিটে গেল। এবার সে জেদ ধরল, একটা কালো টিয়াপাখী চাই। সে-কথা কইবে, গাইবে, নাচবে—তবে ত মজা!

রাজা আবার ভাবনায় পড়লেন। টিয়াপাখী আবার কালো হয়? না কোথাও পাওয়া যায়?

কিন্তু উপায় নেই। মেয়ে চেয়েছে দিতেই হবে। আবার খবর গেল চারদিকে।

রাজার কর্মচারীরা বড়ই বিব্রত। লোকজনের ছুটোছুটি শুরু হল। কালো টিয়া এনে দিতে হবে। সে এনে দিতে পারবে, সে যাবে অনেক টাকা।

যে সোনার মাছি এনে দিয়েছিল, সে ছাড়া আরও একজন চতুর লোক সে-রাজ্যে ছিল। এবার সে কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল। সে ত জানে কালো টিয়াপাখী মিলবে না। টিয়ার রঙ ত সবুজ।

লোকটা একটা সবুজ টিয়া পাখী ধরে সেটাকে কালো রঙে চুবিয়ে নিল। কোথাও তার সবুজের চিহ্ন থাকল না।

সেই টিয়া নিয়ে লোকটা এল রাজদরবারে। রাজা আবার সোনার খাঁচা আনালেন। তারপর সোনার খাঁচায় পুরে সেটাকে মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

লোকটা বললে, মহারাজ, পাখীটা কালো বটে। তবে এখনো কথা বলতে শেখেনি। শিখিয়ে নিতে হবে।

রাজা বললেন, আচ্ছা। তাই হবে।

লোকটা টাকা নিয়ে চলে গেল।

রাজকুমারী কালো টিয়া দেখে খুশী হল। রানী বললেন, মা পাখীটাকে কথা বলতে শেখাতে হবে। নাচ শেখাতে হবে।

রাজকুমারীর আনন্দের সীমা নেই, বললে, তাই হবে, মা। আমিই শেখাব। পাখী কথা বলবে, নাচবে, কি মজা!

পাখীকে কথা বলা শেখাতে হলে ধৈর্যের দরকার। সে ধৈর্য রাজকুমারীর কই? প্রথম ক'দিন খাঁচার কাছে এসে তাকে কথা বলাতে চেষ্টা করল। পাখী কেবল শব্দ করে—ট্যাঁ, ট্যাঁ, ট্যাঁ!

কান ঝালাপালা! একদিন আবার টিয়াটা মাছিটাকে খেয়ে ফেলল। রাজকুমারী ত মহাখাপ্পা। পাখীটা নাচে না, গায় না।

আবার হৈচৈ পড়ে গেল। রাজকুমারী মুখ বেঁকিয়ে বসে আছে। খাওয়া-নাওয়া বন্ধ। কথা বন্ধ।

রানী তাড়াতাড়ি মেয়ের কাছে এলেন। মেয়ে মায়ের দিকে চেয়েও দেখল না। যেমন বসে ছিল, তেমনিই বসে রইল। রানী

মেয়েকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, টিয়া না হয় নাইই পুষলে। তোমাকে আমি আরো ভাল জীব দেব। কি চাও বল।

রাজকুমারী মায়ের দিকে তাকালো। তখনও তার মুখ ভার। হাসি নেই। চোখে জল।

মায়ের বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে রাজকুমারী বললে, আমি একটা বেগুনে রঙের বেড়াল চাই। তার চোখ হবে হলদে।

রানী মেয়ের কথা রাজাকে বললেন। রাজার চোখ কপালে উঠল। এমন বেড়াল কোথায় পাওয়া যায়? এমন কি হয়?

কিন্তু ভাবলে আর কি হবে। খুঁজে দেখতেই হবে এমন বেড়াল। সঙ্গে সঙ্গে যারা পশুপাখী ধরে আর বিক্রী করে, তাদের ডাক পড়ল। তারা এল। রাজার কথা শুনে একজন ছাড়া সকলেই বললে, এ হয় না, মহারাজ। এমন বেড়াল কোথাও পাওয়া যাবে না। রাজকুমারীকে অন্য কোন জীব চাইতে বলুন।

রাজা রেগে উঠলেন, তোমাদের কথা শুনব, না, আমার মেয়ের কথা শুনব? এ বেড়াল চাই। যত টাকা লাগে দেব।

যে লোকটা কথা বলে নি, সে বললে, মহারাজ খুঁজে দেখি।

দিন নেই, রাত নেই, লোকটা দেশে দেশে বেড়াল খুঁজছে। চেষ্টা করলে কিনা পাওয়া যায় পৃথিবীতে।

হলদে চোখওলা বেগুনে রঙের বেড়াল পাওয়া গেল।

লোকটা তাড়াতাড়ি বেড়াল নিয়ে রাজসভায় এল। লোকটা অনেক টাকা নিয়ে চলে গেল।

রাজকুমারী বেড়াল পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। বেড়ালটা বেশ খেলে বেড়ায় আর শব্দ করে, ঘর-র, ঘর-র।

তিনদিন বেশ কেটে গিয়েছে। লোকজন সব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। রাজকুমারীর বুঝি আর কোন আব্দার নেই।

তিনদিন পর বেড়ালটা এক কাণ্ড করে বসল। কালো টিয়া পাখীটার ত আর কোন যত্ন নেই। খাঁচার দরজা খোলাই ছিল। সুযোগ পেয়ে বেড়াল টিয়াপাখীটাকে খেয়ে ফেলল।

রাজকুমারী রেগে আগুন। তার আর বেড়াল চাই না। এবার বায়না হল একটা কুকুর চাই। কুকুরটা হবে গাধার মত বড় আর তার রঙ হবে রূপোর মত সাদা।

ইতিমধ্যে পশুপাখীর ব্যাপারীরা রাজকুমারীর মনের ভাব বুঝে ফেলেছে। তার বায়না মিটলেই হল। কোন পশু বা পাখী বেশী দিন সে পুষবে না। একটু পুরনো হলেই নতুন বায়না ধরবে।

তাই হল। রূপোর রঙ করিয়ে খুব বড় একটা কুকুর নিয়ে এসে রাজকুমারীকে দেওয়া হল। প্রথম দিন এসেই কুকুরটা বেড়ালটাকে মেরে ফেলল। রাজকুমারী কেঁদে আকুল। কুকুর আর সে চায় না।

এবার রাজকুমারীর বায়না হল সিংহের। সিংহ আবার যেমন তেমন হলে হবে না। সিংহটার কেশর হবে সাদা। আর সে কাউকে কিছু বলবে না।

যারা জন্তু ধরে বিক্রী করে, তাদের আবার ডাকা হল। ব্যাপার শুনে সবাই হকচকিয়ে গেল।

এ আবার কি আব্দার ?

কিন্তু উপায় কি ? রাজ্যে বাস করতে হলে রাজার হুকুম না মেনে উপায় নেই। তা নইলে হয় দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। নয়ত প্রাণ যাবে।

ভয়ে ভয়ে সবাই ছুটল চারদিকে। বেশীর ভাগই গা-ঢাকা দিয়ে রইল। কারণ, তারা জানে এমন সিংহ পাওয়া যাবে না। কেশরটাকে হয়ত শাদা রঙ করে দেওয়া যায়, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না, কাউকে ধরে খাবে না, এমন সিংহ মিলবে কোথায় ?

এদের মধ্যে একজনের বুদ্ধি একটু বেশী। সে আর খোঁজা-খুঁজি না করে একটা সিংহশাবক কিনে ফেলল। তারপর তার কেশরগুলোতে শাদা রঙ দিয়ে দিল। এখন ভেড়ার মত সিংহটাকে নিরীহ করে তুলতে পারলেই হয়। সে একটা চাবুক কিনে নিয়ে এল। সিংহ যেই মাথা নাড়ে, কষে সে চাবুক চালায়। একটু যদি নড়ে, আবার পড়ে চাবুক। দাঁত বের করলেও চলে চাবুক। এইভাবে মাসখানেকের মধ্যেই সিংহের শিক্ষা হয়ে গেল। চাবুক দেখলেই সে একেবারে চুপ, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকে। যেন পাষাণমূর্তি !

এই সিংহটাকে রাজকুমারী একটা লোহার খাঁচায় আটকে রাখল।

দিন তিনেক গেল। একদিন সিংহের খাবার দিতে ভুল হয়ে গেল। খাঁচার দরজাও ছিল খোলা। খিদেয় গরগর করতে করতে সে খাঁচার বাইরে এল। সেখানে তখন কুকুরটা শুয়ে ছিল।

সিংহ লাফিয়ে পড়ল কুকুরের উপর। তারপর তার বড় বড় দাঁত দিয়ে কুকুরটা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল।

খবর এল রাজকুমারীর কাছে। রাগে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি হাতে চাবুক নিয়ে এগিয়ে এল।

চাবুক দেখেই সিংহ ভয় পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে খাঁচার মধ্যে ঢুকে গেল।

কিন্তু রাজকুমারী ছাড়বে কেন? সেও চাবুক হাতে খাঁচার মধ্যে এসে সিংহকে সপাসপ চাবুক লাগাতে শুরু করল। তার সোনার মাছি খেয়েছে টিয়া, টিয়াকে খেয়েছে বেড়াল, বেড়ালকে মেরেছে কুকুর, এখন সিংহ খেয়ে ফেলল কুকুরটাকে। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল সিংহটার উপর।

সপাসপ চাবুক চলতে লাগল। সিংহ যতই সরে যায়, ততই চাবুক চলে। সিংহটা শেষ পর্যন্ত খাঁচায় এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল। তবুও কি নিস্তার আছে? চাবুকের শব্দ হচ্ছে সপাং, সপাং।

বাইরে দাঁড়িয়ে সবাই এই কাণ্ড দেখছে। রানী ত ভয়েই অস্থির। মেয়েকে তিনি ডাকছেন। মেয়ে কিন্তু একভাবেই চাবুক চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজার কাছে খবর গেল। রাজা ছুটে এলেন। আর ছুটে এল সেই লোকটা যে সিংহকে চাবুক মেরে শান্তভাবে থাকতে শিখিয়ে ছিল।

হিংস্র বন্যজন্তু আর কত মার সহ্য করিতে পারে? সিংহ

এবার রেগে গর্জে উঠল। একটু সরে গিয়ে রাজকুমারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওত্ পেতে বসল।

রাজা-রাণী ভয়ে শিউরে উঠলেন। রাজকুমারীর প্রাণ বুঝি এবার যায়।

ভয়ে রাজকুমারীও চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটা দেখল বড় বিপদ। এখুনি সিংহটা রাজকুমারীকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে।

সে লাফিয়ে এল খাঁচার কাছে। হেঁচকা টানে রাজকুমারীকে খাঁচা থেকে বার করে নিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দোর বন্ধ করে দিল।

বিপদ কেটে গেল।

রাজকুমারী চেঁচিয়ে বলে, আমি চাই না সিংহ। এটাকে এখুনি সরিয়ে নিয়ে যাও।

এবার লোকটা একটা ছোট চাবুক বার করে রাজকুমারীর দিকে চেয়ে বলে, আমি চলে যাচ্ছি, মা। তবে যাবার আগে তোমাকে একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই।

এই বলে সে সপাং সপাং করে কয়েক ঘা চাবুক বসিয়ে দিল রাজকুমারীর পিঠে।

আশ্চর্য ব্যাপার! রাজকুমারী চেঁচাল না, কাঁদল না,—মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আসলে আব্দার পেয়ে পেয়ে সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনো তার মন নষ্ট হয়নি, কঠিন হয়ে ওঠেনি।

লোকটা রাজার দিকে চেয়ে বলে, মহারাজ, যে খেয়ালী আর নিষ্ঠুর, এমন শাস্তিই তার পাওয়া উচিত। যা করেছি তা রাজকুমারীর ভালোর জন্যই করেছি।

রাজা জবাব দেন, তুমি অন্যায় করনি। ঠিক কাজই করেছ। তোমাকে আমি পুরস্কার দেব।

এমন সময় এল এক জাদুকর। শুনতে পেল সব কথা। কিন্তু রাজকুমারীর জন্যও তার দুঃখও হ'ল। সে বার করল তার জাদুদণ্ড। সিংহের মাথার কাছে সেটা চারবার ঘোরাল।

আশ্চর্য কাণ্ড!

সিংহের মুখ থেকে বার হয়ে এল জ্যান্ত কুকুর। কুকুরের মুখ থেকে বার হ'ল জ্যান্ত বেড়াল। বেড়ালের মুখ থেকে বার হ'ল টিয়া আর টিয়ার মুখ থেকে ফর ফর করে বার হয়ে এল জ্যান্ত মাছি।

লোকটা রাজকুমারীর মুখের দিকে চেয়ে বলে, মা তুমি সব পশু আর পাখী ফিরে পেলে। এবার থেকে এদের ভালবাসবে, যত্ন করবে। তাহলে এরাও তোমার বশে থাকবে, তোমাকে ভালবাসবে।
